শেষ দরবার

সমরেশ বসু

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : প্রদোষকান্তি বর্মন

মুদ্রাকর : প্রফুল্লকুমার বক্সী : জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু

এই উপন্যাসে বর্ণিত গ্রাম বাজসিদ্ধি। বাজসিদ্ধিব চবিত্রগুলি, সবই কাল্পনিক। বাজসিদ্ধি গ্রামেব নামও কল্পিত। কথাটা বলতে হল এই কারণে, উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্রেব সঙ্গে বাস্তবে কোনো সাদৃশ্য দেখতে পেলে সেটা নিতান্তই আকস্মিক মনে করতে হবে।

বাজসিদ্ধি গ্রাম ও তাব উৎসব, আমাব কাছে বর্তমান পৃথিবীর এক প্রতীক বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু, এ শুধু মনে হওয়া। প্রতীকের সার্থক রূপ ফুটিযে তোলা গেছে কি না, সে সংশয় বইলই। বিচার তো মহাবিচাবক পাঠকের হাতে।

তা ছাড়া সংবাদ সামান্যই আছে। বচনাটি আনন্দবাজার দোল সংখ্যায় ১৩৬৭ সালে বেবিযেছিল। পবিবর্তন হযেছে। আসলে পবিবর্ধনই বেশী হয়েছে।

স ব

আপাতশেষ চড়াই-এর চূড়োয়, যেখানে অতিরিক্ত মেদ-স্ফীত, চাংড়া চাংড়া মাংস ঝুলে পড়ার মতো ড্যালাডুমরি পাকানো গুঁড়িওয়ালা বুড়ো বেঁটে পলাশ গাছটা নুয়ে পড়েছে, সেখানে সে ভেসে উঠল। জেগে উঠল ধীরে ধীরে। যেন সে খুব ধীরে ধীরে মাথা তুলল। উঠে এল হামা দিয়ে দিয়ে। হিংস্র মাংসাশীরা যেভাবে আসে। সন্তর্পণে, নিঃশব্দে। এবং তার তীক্ষ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি প্রায় সেই রকম। দূর সন্ধানী, সাবধানী। কঠিন চোয়াল, শক্তবদ্ধ ঠোঁট, মাথা ভরতি চুলের অন্ধকারে তার শিকারী প্রবত্তি সুস্পষ্ট।

কিন্তু চোখের চাউনিতে তাকে দিগ্‌ভ্রান্ত মনে হল। আর তার নিজের মনে হল, সময়ের দড়িতে নাক-বাঁধা সূর্যটা দিগ্‌ভ্রান্ত কি না। কিছুক্ষণ আগেই সূর্যকে সে তার ডান দিকে দেখেছে। ঢলে পড়েছিল, আর লাল হচ্ছিল। এখন দেখল, মুখোমুখি রক্তাক্ত অবস্থা। যেন চাবুক খাচ্ছে। আর সময় নেই, তাই দূরের ওই শালবনের বুকেই-মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজছে।

হতে পারে সূর্যের দিক ভুল হয়েছে। কিন্তু তাতে তার কিছু যায় আসে না। ওদিকটা দক্ষিণ দিক হলেও তার কিছু যায় আসে না। তার পিছনে ছিলে-কাটা সোনার লম্বা লম্বা পাতের মতো মেঘ যে আকাশটায় ছড়িয়ে আছে, সেটা পশ্চিম হলেও ক্ষতি নেই। উৎরাইয়ের ঢালে যে লাল সড়কটা আনমনে এঁকেবেঁকে তার চোখের সামনেই নেমে গেছে বাবলাবনের মধ্যে, সেইদিকে তার দৃষ্টি। তারপরে কাঁদর। কথাটা কি কন্দর থেকে এসেছে?

এক মুহূর্তের জন্য, সাত বছর আগে, বাংলায় অনার্স পরীক্ষা দেবার উত্তেজিত নখ-খোঁটা দিনগুলির কথা তার মনে পড়ল। পরমুহূর্তেই সে নিজেকে বলে উঠল, মুর্খ! অনার্স সে পায়নি। পেলেই বা কি

আসত যেত। বাবলাবনের ওধারে কাঁদর কন্দর খন্দ, যা খুশি তাই হতে পারে ওটা।

যে গ্রামে সে যেতে চায়, কাঁদরের ওপারে, আবার একটা চড়াইয়ের বুকে সেই গ্রামটা সে দেখতে পাচ্ছে। আশেপাশে আর গ্রাম নেই। একটাই গ্রাম, যার তিন-দিকের আকাশেই প্রায় গুপ্ত প্রহরীর মতো অস্পষ্ট পাহাড়ের সীমানা দেখা যায়। যে খোলা দিক দিয়ে সে ঢুকতে যাচ্ছে, তার কয়েক মাইল পিছনে পড়ে আছে বীরভূমের সীমান্ত। এখন বলে পশ্চিম বাংলার সীমান্ত।

এটা সাঁওতালভূমি। আদিভূমি। তাই রক্তাক্ত এ মৃত্তিকা। যত প্রাচীন, রক্তপাতের চিহ্ন তত। যোদ্ধারা সব শাল তাল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি না, কে জানে। অনড় নীরব এইসব গাছেরা যেন সবে এই শুকু-শুকু হেমন্ত-আকাশের তলায় মাথা নত, ক্লান্ত। স্মৃতি-তাড়িত বাতাসেই একমাত্র যারা মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে।

বাতাস বইছে অল্প অল্প। আর সেই বাতাসে শীত-শীত ভাব। দুদিন বৃষ্টি হয়েছে। কুঁকড়ে উঠেছে কার্তিকের আকাশ। এবার মুড়ি দেবে শীত। এই বোধহয় শেষ বর্ষণ গেল শীতের আগে।

আজ অমাবস্যা। তাই শীত-শীত আমেজটা একটু জোরালো। কাল গেছে ভূত চতুর্দশী। আজ কালীপূজা। তাই সে এসেছে। যাবে কাঁদরের ওপারের ওই গ্রামে। যে গ্রামের নাম বাজসিদ্ধি। যার প্রবেশের পথে পথে তালের তোরণ। শাল এবং মহুয়ার বীথি যে-গ্রামকে ঢেকে রেখেছে।

চড়াইয়ের চূড়ো থেকে সে নামতে লাগল। বাজসিদ্ধি গ্রামেই তার সিদ্ধবস্তু আছে। বয়সের চেয়ে প্রবীণ রেখাগুলি তার সাতাশ বছরের মুখে আরো গভীর হল। তীক্ষ্ণ হল। বয়স দাগ টানে না মুখে। জীবন-ধারণের নিয়ম তার ছুরি বসিয়ে বসিয়ে দাগ টানে। সে যাকে ছুরি বসায় না, তার মুখ রেখাবর্জিত মাংসল সুগোল।

এ মুখটা ক্ষতবিক্ষত। জীবনধারণ ওর ঠোঁট দিয়েছে উল্টে। ঠোঁটের কোণে দিয়েছে একটি গভীর বাঁকা দাগ। নাকের দু'পাশে

অবিশ্বাস আর ঘৃণার গাঢ় রেখা দিয়েছে টেনে। তীক্ষ্ণ চোখের চার পাশে মরা-বাঁচার সন্দিগ্ধ হিজিবিজি আর কপালের সর্পিল রেখাগুলি লুকানো, শান্ত। ধীর স্থির দূরসন্ধানী সেই রেখা সহসা ধরা দেয় না।

আর দেখলেই বোঝা যায়, শহরের ঝড় ওর মুখটা তৈরী করেছে। ঝাপটা দিয়ে, আছড়ে, মুখ থুবড়ে ফেলে ফেলে, থেঁত্‌লে ঘষে ঘষে শক্ত মুখটি শহরের কঠিন হাতে গড়া। সে এসেছে গ্রামে। এই বাজসিদ্ধি গ্রামে, বয়স যার তিনশোর ওপারে। যে গ্রাম দেবে তাকে এই শেষ বিংশ শতকের জীবনধারণের পরোয়ানা। কোনো এক অফিসের খোলা দরজা, একটি টেবিল, কালি কলম আর চিন্তাহীন মূঢ় কলম চালাবার অভ্যাস, কেরানীগিরি।

তাই সে বাজসিদ্ধিতে চলেছে।

মাটি ভেজা, থকথকে লাল কাদা, গলিত মাংসের মতো। তার শক্ত কেডস্-এর তলা কখনো কামড়ে ধরছে। হড়কে যাচ্ছে কখনো। এর আগে গরুর গাড়িতে সে এ পথে এসেছিল। বছর দশেক আগে। এক দূর আত্মীয়তার সূত্র ধরে এসেছিল যে-আত্মীয়তার কোনো পরিচয় দেওয়া যায় না। সেই প্রায় সইয়েয় বউয়ের বকুল ফুলের···।

আর কোনোদিন আসবে বলে ভাবেনি। প্রয়োজন দূরের কথা, বেড়াতে আসার কথাও মনে হয়নি। কিন্তু যে-ভাগ্যকে সে তার জীবন-নিয়ন্তা হতে দিতে চায়নি, সে বরাবর এমনি ওলটপালট করেছে। এলোপাথারি মেরেছে। সেই বাজসিদ্ধিতেই তাকে আসতে হল।

বাজসিদ্ধি। কোথায় গেল সেই বুড়ো সাঁওতাল মাঝিটা। যে তাকে স্টেশন থেকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছিল। যার সঙ্গে ছিল বুড়ি, বউ, ছেলে, ছেলের বউ আর আইবুড়ো মেয়ে। আর ছিল কালো নধর কচি পাঁঠা, বাজসিদ্ধির কালীপুজোর বলি। আর পচুই খাওয়া, দামড়া মোষের মতো ছেলেটা, যে তার কাঁধের মাদলে মারছিল এলোপাথারি চাঁটি। বুড়ো বুড়ি মেয়ে বউ, সকলেই হাসছিল, ঢুলছিল, এলিয়ে এলিয়ে পড়ছিল। ওদের সকলের পায়েই

তাল লেগেছিল। বাপ ছেলে খালি গা হয়েছিল। মেয়েরা উদাস করেছিল অঙ্গ। কারণ ওদের গরম লাগছিল। পচুইয়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশে ওরা দপদপিয়ে জ্বলছিল।

কোথায় গেল ওরা। এই উঁচু নিচু লাল সবুজ প্রান্তরের কোথা থেকে যেন সেই শব্দটা এখনো ভেসে আসছে। সেই আদিম কাল আর গহন অরণ্য থেকে যেন মৃত্যুর উৎকণ্ঠিত যাত্রা ঘোষণা করা হয়েছিল। ডিম্ ডিম্ ডিম্ ।

মাদলের শব্দটা শোনা যায়, ওদের দেখা যায় না।

সেই বুড়ো মাঝিটার কথা মনে পড়ছে।—তু রাজাসিধি যাবি বাবু? চিনবেক ক্যানে নাইরে?

বুড়ো হেসেছিল। আর সবাইও হেসে উঠেছিল। বাজসিদ্ধিকে রাজাসিধি করে সে বলেছিল, উইটা আমাদিগের আজা-র গাঁ, ক্যানে চিনবেক নাই? তু এট্টো জামাই, লা কী? লা? অ। তু ভাগ্না? লয়? তু এট্টো সরকারী বাবু বটে? তমকা সদর থিক্যা আসছিস? লয়? অ!

বুড়োটা আপন মনে বকেই চলেছিল।—'সি রাজটোর কথা তু শুনিস নাই কি হে? রাজপক্ষী। মানসো খায়, সাপ খায়, রাজপক্ষী?'

বোঝা যাচ্ছিল, সে রাজপক্ষীর কথা বলছিল।—দিল্লীর লবাবটো তখন যাচ্ছিল ই রাজাসিধির মাঠ ভেঙে ভেঙে। তখন তুর জম্মো হয় নাই বাবু! আমার হয় নাই। আমার বাপটো জম্মে নাই, তার বাপটো জম্মে নাই। সি তুর ধম্মোযুগের কথা বটে। আমাদিগের আজা-টো ঠাকুরদিগের ব্যাটা, তখন ছেল্যামানুষ, খোকা। দুধ পারা রং, খোকা আজা-টো, বড় কাঁদরের ধারে গরু চরাচ্ছিল। ত' এট্টো রাজ আসে বসল তার হাতে। সোনার শিকলি তার পায়ে বান্ধা। ই কার গ? অ্যাঁ, ই রাজপাখীটো কার?...জানিস ক্যানে বাবু?

—না।

—ক্যানে, উ লবাবের বটে। দিল্লীর লবাবটো না তাম্বু ফেলেছিল উই মাছুচুয়ার মাঠে? লবাব হাতে লিয়ে সোহাগ কচ্ছেল রাজটোকো। ত, রাজপাখীটোর কি মনে লিল, উড়ে পালায়ে যেইল। আ। ধব্ ধব্, আ। ধব্ ধব। কিন্তুক পলায়ে যেইল। এক ঝাঁপটে খোকাঠাকুরের হাতে। অ্যাই মন কান্দে লবাবটোর। খেতে সোখ্ নাই, স্তুতে মন নাই। উজীরকে বুলে দিলেক, সারা পিথিমীতে ঢোল মেরে দাওগা, যি মানুষ আমার রাজটোকে ধরে দিবেক, উযাকে আজা বানিযে দিব। ত লবাবের উজীর ছুটলেক, পাইক ফৌজ ছুটলেক, খবর ছড়িযে দিলেক, তামাম দেশে। গরীব খোকা ঠাকুরটো তখন রাড়ি মায়ের কাছে বসে ভাত খাচ্ছেল, আর রাজটোকে আদর কচ্ছেল। ইদিকে ত লবাবের হুকুম শুনে দেশের তাবৎ মানুষ রাজ খুঁজতে বাইরিয়ে পড়েছে। খুঁজতে খুজতে খোকা ঠাকুরের সন্ধান মিলল। খোকা ঠাকুরকে শুদ্ধা রাজপাখী লিযে গেল লবাবের তাম্বুতে। লবাব ত ভারী খুশী। বুইললে, অ্যাই খোকা, তু কাল বিহানে সুরুজ উঠলে ঘোড়া চেপে যাবি, সুরুজ ডুবলে তাম্বুতে ফিরবি। যত জমিল ঘুর‍্যা আসবি, তু হবি তার মালিক। ত' তাই গেলছিল খোকাঠাকুর। এক লাট, দু লাট, তিন লাট, কত কত লাট ঘুর‍্যা আসলেক। ত লবাব তখন খানা খেতে বসছে। খোকাটোকে ডাকলেক। বুইললে, তু আজা হলি। তুর কুন কর লাগবেক নাই। সব লিস্কর। সি হল এই দেশটোর নাম, রাজাসিধি।

খোকাঠাকুরের মামা ছিল কাছকে। বইললে, লবাব সাহেব দলিল কুথা?

আমীন তাড়াতাড়ি দলিলটো বাড়িয়ে দিলে। লবাব এঁটো হাতের ছাপ মেরে দিয়ে বুইললে, এই লে আমার ফারমান।··

তঁ রাজপাখীর দৌলতেই সব। তাই গাঁয়ের নাম হল, রাজাসিধি। অর্থাৎ রাজসিদ্ধি। হয় তো সত্যি। হয় তো মিথ্যে। কিংবদন্তীর কোনো দলিলদস্তাবেজ থাকে না। বুড়োটা তখনো বক্‌বক্ করছিল।

সে এসে দাঁড়িয়েছিল শেষ চড়াইয়ের ওপরে। তখন চেনা চেনা লাগছিল রাস্তাটা। এই রাস্তা ধরেই দশ বছর আগে সে গিয়েছিল গরুরগাড়ি চেপে। বুড়োটার কথা সে ভুলে গেল। বুড়োটাও কোথায় চলে গেল বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে।

কিংবদন্তী সত্যি হতে পারে, মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু গ্রামটা পুরনো। তার একটা অতীত আছে। কয়েক শো বছরের অতীত। রাজপাখী মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু রাজা ছিল। এখনো আছে। এক ঘর রাজা এখন শত ঘরে বেড়েছে। এক রাজার ঘর চক্রবর্তীরাই বেড়েছে আট ঘরে। ঘরজামাই রেখে নাকি দৌহিত্র বংশ দিয়েই বাজসিদ্ধি গ্রামের লোকবল।

এখন রাজা প্রজা চেনা দায়। রাজা আর কেউ বলে না। নিষ্কর তো কল্পনা। ইংরাজেরা তবু জমিদার বলে মেনেছিল। এখন মধ্যস্বত্ব ভোগও রয় কি না রয়। তবু রাজারা নাকি রাজা-ই আছেন।

প্রাসাদপুরী রাজারা কোনোদিন নাকি গড়েননি।

এখানেও সেই বহুশ্রুত, প্রচলিত দৈব-দুর্ঘটনার কাহিনী। মস্তবড় এক প্রাসাদপুরী তৈরী হয়েছিল। তিন বছর ধরে তৈরী হতে হতে, বাজসিদ্ধির পাশের তালুকের জমিদার বেহারী মুসলমান নসিরুল্লার সঙ্গে ঝগড়া বেধে উঠেছিল। গৃহপ্রবেশের দিন সকালবেলা খবর এল, নসিরুল্লা ফৌজ নিয়ে জমায়েত হয়েছে মাহুচুয়ার মাঠে। গৃহপ্রবেশ আর হল না। রাজা ফৌজ নিয়ে ছুটলেন মাহুচুয়ার ময়দানে মোকাবিলা করতে। রণদামামা বাজল। মাহুচুয়ার ময়দানে রাজা নিহত হলেন। রানী রাজপুত্র সহ পারিষদদের সঙ্গে চলে গেলেন বীরভূমের এক গ্রামে। সেই থেকে কোঠাবাড়ি রাজবংশে নিষিদ্ধ। তার সঙ্গে রাজকীয় বিলাসব্যসন।

রাজাদের কাপড় নামেনি হাঁটুর নীচে।

এখন বাজসিদ্ধির শরীরের সীমানা থেকে পায়ের পাতা কেটে ঢুকেছে বীরভূমে। বাকী অঙ্গ বিহারে। দুমকা থেকে বিহারী মহাজন এখন নাকি রাজার উঠোন জাঁকিয়ে বসে।

হয় তো বসে, হয় তো বসে না। রাজকীয়তা যেমনই থাক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু গ্রামটা প্রাচীন। পুণ্যবান রাজা আর পুণ্যবতী রানীরা ছিলেন। তাঁদের ধ্বসে-পড়া জরাগ্রস্ত কীর্তির চিহ্নই আছে শুধু বাজসিদ্ধির দেবদেবীর পোড়ো ভিটায় আর জঙ্গলে। শত পাক শিকড়ে শিকড়ে, ঝুরি-নামা বটের থাবায়।

ইট-পাথরের ঘরে রাজারা বাস করেননি। কিন্তু ইট-পাথরের শত শত দেবদেউল তৈরী করিয়ে ছিলেন। বাজসিদ্ধির রাজাদের রাজকীয়তার সেই সব থেকে বড় সাক্ষী।

তাই সে এসেছে এখানে। সশস্ত্র এসেছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে আছে তার অস্ত্র আর তরল আগুনের বিষ। চক্রবর্তীদের গরু-চরানিয়া ছেলের হাতে সিদ্ধিকাম বাজ এসে বসেছিল কিনা কে জানে। তার সিদ্ধবস্তু আছে এই গ্রামে। তিনশো বছরের অন্ধকারে, দুধগোখরোর গ্রাসে।

আজ এই সেই সময়। আজ কালী জার মহানিশা। আজ সুরু। কাল সকাল থেকে চলবে উৎসবের মত্ততা। মত্ততার পরেই বাজসিদ্ধি মৃত্যুর মত অবসাদে ঢলে পড়বে। তখন ?

তখন যদি অশরীরী ছায়ারা ঘিরে ধরে, সে ভয় পাবে না। মায়া-কণ্ঠ যত মায়া করে ডাকুক, সে শুনবে না। রাত্রের অন্ধকারেই চড়াই নয়, উৎরাইয়ের আড়ালে আড়ালে, শালবনের জোনাকির আলোয় আলোয়, অনড় নিঃশব্দ সাক্ষীর দল-পাকানো প্রেতমূর্তির মতো তালবনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটে পালাবে। শেষ রাত্রির গাড়ি ধরে একেবারে কলকাতা।

তারপর · তারপর পুনর্জীবন। পুনর্জীবনের পরোয়ানা নিয়ে সে দশটায় যাবে, পাঁচটায় ফিরবে। চাকরি, শৃঙ্খলা, জীবনের রাজপথের বাসিন্দাদের মতোই সে খাবে, পরবে, আর....আর তখনো যদি মীনাক্ষীকে পাওয়া যায়—মীনাক্ষী.... !

জলের ছলছল আর খিলখিল হাসিতে চমকে উঠল। কাঁদরের ধারে এসে পড়েছে সে। সামনে মেয়েদের ঘাট। মেয়েরা গা ধুচ্ছিল,

কাপড় কাচছিল। কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে সব থমকে রয়েছে। ঘাটের কাছে ভিন্‌দেশী পুরুষ।

কাঁদরে হাঁটুজল। পাহাড়ী ঝর্না বলা যায়। দু'পাশে বড় বড় কালো পাথর আর নুড়ির ছড়াছড়ি। ঢল-নামা জল, কল কল শব্দে ছুটেছে। সূর্যের শেষ আভায়, স্রোতের বুকে যেন সোনালী বাজের পাখার ঝিলিমিলি খেলছে। দূর রক্তাভ আকাশের গায়ে প্রহরী পাহাড়ের যে-কালচে রেখাটি চোখে পড়ে, বোধহয় তারই বুক চিরে এসেছে এ কাঁদর।

কালো সুঠাম গলায় যার রূপোর হারের ঝিকিমিকি, হাঁটু অবধি যার পা ডোবানো জলে, সাঁজবেলায় খোলা চুল এলিয়ে, কোমরে হাত দিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠল, অই গ' আবার কুন্ তরফের অতিথি আস্‌ল দেখেক্ ক্যানে। পথ চিনে না।

হ্যাঁ, পথ ভুল হয়েছে। দশ বছর আগে হলেও, কাঁদরের ওপরে একটি সাঁকো পার হওয়ার কথা মনে আছে। কাঁকড়-ছড়ানো কচ্ছপের পিঠের মতো রাস্তা সেটা ছিল না। গরুর গাড়ি চলার মতো রাস্তা ছিল। আশেপাশে ছিল আমবাগান। সে ঘুরে দাঁড়াল।

পিছন থেকে সেই গলা আবার শোনা গেল, কুন্ তরফে যাবেন গ' অই বাবু।

মনে আছে কোন্ তরফ। বড় তরফে যাবে সে। বড় তরফের বড়কর্তার ছোট ভাইয়ের শ্যালকের দূর-ভ্রাতুষ্পুত্র সে। এ আত্মীয়তার পরিচয় একালে টেঁকে না। তার চেয়ে কাছাকাছি পর অনেক আপন। তবু সে এসেছে। আত্মীয়-পরিচয় না থাকলেও আসত। বিদেশী-দর্শকের ভূমিকায় আসত।

সে ঘুরে বলল, গগনেশ্বর চক্রবর্তীর বাড়ি যাব।

বড়কর্তার নাম বলল সে। যারা ঘোমটা দিয়ে, কাপড় ঢেকে কাঁদরের জলে বসেছিল জড়সড় হয়ে, মেয়েটি তাদের দিকে ফিরল। তারপরে বলল, অ, সে তো বড় তরফ। সাঁকো দূরে রইছে, নদীটে ডিঙিয়ে যান ক্যানে গ, বড় তরফ কাছকে হবে।

এই সরু স্রোতস্বিনীকে এরা নদী বলে। বলতে পারে। আষাঢ়ে শ্রাবণে এ কাঁদরকে এরা নদী হতে দেখে। গর্জন শুনে ভয় পায়। হয় তো বাজসিদ্ধির বুকের মাটি খায় লুপলুপিয়ে। দিনে তুমি রাজার সোহাগ-পাখী রূপকুমারী, রাতে হও রাক্ষসী।

তাকে পথ চিনিয়ে দিচ্ছে। ওটা বিদেশীর প্রতি সৌজন্য। বোঝা যায়, মেয়েটি হয় তো নিম্ন শ্রেণীদের মেয়ে বউ। বাকীরা উচ্চ-কোটি গৌরবে আড়ষ্ট। হয়তো তারা রানী, রাজকন্যা।

তাই হোক্, এই নদীই ডিঙোবে সে। এ আমন্ত্রণ হোক্ শুভ। কিন্তু সাবধান! পা পিছলে যেতে চায়। রাস্তা ঢালু। পাথরের ওপর মাটি কাদা-কাদা॥

মেয়েদের জটলায় যেন কিসের আলোচনা হয়। আর সেই মেয়েটির গলা শোনা যায়, তা কী! যোয়ান মানুষ না বটে?

হয় তো নদী ডিঙোতে বলাটা অসৌজন্য মনে হয়েছে অনেকের। কিন্তু যোয়ান অতিথি কেন দূরে ঘুরে নিটোল পথে যাবে, ও-মেয়েটা তা জানে না।

সে লাফ দিয়ে ওপারে পড়ল।

হেসে উঠল মেয়েটি। যেন তারই প্রতিধ্বনি করে চড়া সপ্তমে আর একটি শব্দ খিল্‌খিল্ করে বেজে উঠল বাজসিদ্ধির আকাশে। পরমুহূর্তেই সে শব্দ সহসা স্খলিত হয়ে থেমে গেল। যেন কেউ গলা টিপে ধরল।

শব্দটা ঢাক বেজে ওঠার। এ নিশ্চয় উৎসবের সুরু নয়। ঢাকীরা তাদের আগমন ঘোষণা করেছে। কিন্তু শব্দটা কী আশ্চর্য চড়া, টান-টান। ডাকিনীর হাসির মতো! কিন্তু এ শুধু সামান্য ভূমিকা। কৃষ্ণতিথির বাজসিদ্ধিতে ঘোর মহানিশায় এই শব্দ বাজবে।. তখন থেকে সুরু। তখন এ শব্দ শুনলে বুকের মধ্যে কাঁপবে। মনে হবে বাজসিদ্ধির অন্ধকারে কারা যেন নেমে এসেছে, ছুটছে বাতাসে ভর করে, আর মাটি কাঁপছে থরথরিয়ে। ঢাকের ডগর তাদেরই হাসির বোলের মতো শোনাবে।

তখন থেকে সে আর ঘুমোবে না। কারণ তারপরে আর চব্বিশ ঘণ্টাও সময় পাওয়া যাবে না। রাত্রেই তাকে সন্ধানে বেরুতে হবে। এই রাত্রির আত্মায় সে মিশবে।

অশথের ঝুপসি, লতাগুল্মের অন্ধকার। সে থমকে দাঁড়ায়। অশথের শিকড়ের গ্রাসে উঁকি দিচ্ছে সেই রক্তবর্ণ ইট, গায়ে যার কারুকার্য খচিত। রচিত সব পৌরাণিক কাহিনীর ইতিবৃত্ত।

বাজসিদ্ধি প্রাচীন, এই তার চিহ্ন। কিংবদন্তী নয়, এই নাকি প্রত্যক্ষ। গ্রামবাসীর ঘরের থেকে বাজসিদ্ধিতে মন্দির বেশী। গ্রামের মানুষের চেয়ে মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর সংখ্যা বেশী। রাঁড় ষাঁড় সন্নেসীর তুলনায় বাজসিদ্ধি কাশী নয়। শুধু মন্দিরের জন্যেই বাজসিদ্ধি নাকি কাশীতুল্য কথিত।

কিন্তু কোন্ মন্দির এটা? কোন্ তরফের কোন্ দিকের? পূর্বে না, পশ্চিমে? উত্তরে না দক্ষিণে?

খোকারাজার সিদ্ধকাম বাজ নয়, শিকারী বাজের মতো তীক্ষ্ণতা ওর দু'চোখে। নিস্তরঙ্গ শান্ত কপালে সেই গুপ্ত রেখাগুলি উঠল কিলবিলিয়ে। শহরের ক্রূর নিষ্ঠুর হাতে গড়া মুখখানি তীব্র রেখায় উঠল ভরে। সে অগ্রসর হতে গেল অশথের ঝুপসিতে।

মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। বোঝা গেল ঝোপের ওপাশে গ্রামের রাস্তা। লোক চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গরুর গাড়ির চাকার একটা হাঁফ ধরা ককানি শব্দ শোনা যায়। মন্দিরের কাছ থেকে ফিরে এল সে। বাঁ দিকে তালগাছের সারি। পাশ দিয়ে রাস্তায় এসে উঠল।

রাস্তাটা উঁচুতে উঠেছে। গ্রামটাও তাই ক্রমেই উঁচুতে উঠেছে। বোঝা যায়, একটি সুবিস্তৃত চড়াইয়ের ওপর বাজসিদ্ধি গ্রামের পত্তন হয়েছিল।

—কুথা যাবেন গ' বাবা!

কে? কাকে বলছে? সে ফিরে তাকাল আশেপাশে। রাস্তার পাশে ভাঙা দেওয়াল। ইটের রং চেনা যায় না। ঘুঁটের দেয়াল হয়ে

উঠেছে। বোঝা যায়, মন্দিরের সীমানা ছিল দেয়ালটা! মন্দিরের মাথাটা মন্দিরের পায়ে পড়েছে। পোড়া ইটের গায়ে, কুকুরছট্‌কে লতার বেষ্টনীতে রুদ্ধশ্বাস দেবদেবীরা। সেদিক থেকেই একজন এগিয়ে এলেন বুড়ো মানুষ। ফতুয়া গায়ে, কিন্তু বুক খোলা। টকটকে ফরসা রং, পিঙ্গল চোখ আর কদম ছাঁট ধূসর চুল। তেলচিটে উপবীত দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, হয় তো বাজসিদ্ধির রাজার বংশধরদের কেউ। রাজা প্রজার ভাষা নাকি চিরকালই এক।

—কুথা যাবেন মশায়?

তাকেই জিজ্ঞাসা করেছে। অপরিচিত অতিথিকে।

—গগনেশ্বর চক্রবর্তীর বাড়ি।

—অ! বড় তরফে? কুথা থিক্যা আসা হচ্ছে?

—কলকাতা।

—অ।

পিঙ্গল চোখ দুটি ভেজা ভেজা, গলা গলা। কিন্তু যখন চোখ তুলে আপাদমস্তক দেখলেন, মনে হল অতিথির বুকের ভিতরে চুঁইয়ে ঢুকছে সেই গলিত দৃষ্টি। বললেন, ডোমনের শ্বশুরবাড়ি থিক্যা আসছেন বুঝি?

—আমি গগনেশ্বর চক্রবর্তীর বাড়ি যাব।

পথ-চলতি গ্রামবাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই তার। বেশী কথা সে বলতে চায় না। মন নেই। গ্রামটা তাকে ঘুরতে হবে। তার আগে চাই পরিচয় এবং আশ্রয়। তারপর গোটা বাজসিদ্ধি টহল দিয়ে তাকে নিশ্চিত হতে হবে। চিনে নিতে হবে সঠিক জায়গা।

ঘড়ঘড়ে শান্ত গলায় বুড়ো বললেন, হু', বুঝলুম। অই গগন ডোমন সব এক বাবা!

পরমুহূর্তেই হঠাৎ গলা তুলে চীৎকার করে উঠলেন, আই চান্দু! আই, কুথা গেলি র‍্যা?

কাকে ডাকছেন? লোক কোথায়? সামনের পথে কেবল পিছন থেকে কাঁধ দিয়ে চড়াই ঠেলে ঠেলে গরুর গাড়ি তুলছিল একজন।

কিন্তু সে-ই চীৎকার করে জবাব দিল, কী বইলছেন গ ?

—অ্যাই ছ্যাখ্‌ এ বাবুটোকে লিয়ে যা। ডোমনের বাড়িটো দেখায়া দে ক্যানে ?

তার দিকে ফিরে বললেন, যাও বাবা, যাওগা উয়ার পিছু-পিছু, দেখায়া দিবেক।

গাড়ির ককানির সঙ্গে চীৎকার ভেসে এল, আসেন গ।

সে এগিয়ে গেল। যাবার আগে একবার দেখে গেল মাথাভাঙা মন্দিরটা। দশ বছর আগে যখন সে এসেছিল, তখন কোথায় ছিল মন্দিরগুলি ? চোখে পড়েনি কেন ?

পড়েনি, কারণ মন এবং দৃষ্টি বদলে গিয়েছে। দশ বছর আগে বেড়াতে এসেছিল সাঁওতাল পরগণার এক গ্রামে। দশ বছর পরে এসেছে জীবনধারণের পরোয়ানার খোঁজে। সতর বছর বয়েসে গ্রামটা বেড়াতে ভাল লাগেনি। সাতাশ বছর বয়েসে ভাল মন্দের বোধ গেছে ঘুচে। সতর বছরে ছিল আশা-বিশ্বাস। এখন ঘৃণা আর অবিশ্বাস ঠেলে এনেছে এখানে। শহর যেন কর্পোরেশনের কুকুরমারাদের মতো তাড়িয়ে এনেছে। প্রভুর ঘরের বেল্ট গলায় না ঝুললে বেঁচে থাকা দায়।

ওর চোখের কোলে হিজিবিজি গভীর এবং কঠিন হয়ে উঠল। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। কিন্তু গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে সে। চড়াই ছেড়ে, সমতল দেখা দিয়েছে। আশেপাশে লোকজন দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটছে, খেলছে। আর ওকেই লক্ষ্য করছে। সবাই তাকে দেখছে। তার বিলিতি পপলিনের শার্ট, শাদা জিনের প্যান্ট আর কাঁধে ব্যাগ, গ্রামের চোখে আজকাল নিশ্চয় কিছু নতুন নয়। মানুষটা অচেনা বলে অভিনব। কিন্তু পোশাকগুলি ধার করা। ব্যাগটাও। জানলে হয় তো বেশী অবাক হত সবাই। নিজে একদিন কিনে পরবে, তাই সে ধার করে পরে এসেছে আজ।

হয় তো নিঝুম থাকত এখন গ্রাম। কিন্তু প্রাক্‌-উৎসব জটলা চলেছে এখানে ওখানে। কালীপুজোই বাজসিদ্ধির সবচেয়ে বড়

উৎসব। গ্রামে তাই আত্মীয় স্বজন ভিড় বাড়িয়েছে। এখন থেকেই ভিড় করছে সাঁওতাল নরনারী প্রজারা।

গাড়োয়ানটা হঠাৎ দাঁড়াল মোড়ের কাছে। সে চান্দু গাড়োয়ান, খালি গা, নেংটি-পরা, পেটা শরীরের খানে খানে দাদের চিহ্ন। বোধহয় ধান ভাঙিয়ে চাল নিয়ে আসছে ধানকল থেকে। অনেকগুলি বস্তা চাপানো রয়েছে গাড়িতে।

বাঁ-দিকের মোড় দেখিয়ে বললে, ই পথে যান বাবু। খানিক যেইলে পরে দেখবেন ঠাকুরদালানের মণ্ডপে কালী পিতিমে সাজাচ্ছে। সি বাড়িটো বড় তরফের।

সে বাঁক নিতে গেল। চান্দু ডাকল, বাবু!

ফিরে তাকাল সে। চান্দু কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল। বলল, গড় করি বাবু।

বলেই বলদের গায়ে খোঁচা দিয়ে বলে উঠল, চ চ চ, চ ক্যানে।

সে এক মুহূর্তে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী বলতে চাইল লোকটা? বখশিস্? তবে অমন নিরাসক্তভাবে চলে যাবে কেন? হয় তো বড় তরফের রাজ-অতিথিকে সম্মান দেখান হল।

সে এগিয়ে গেল। খানিকটা যেতেই ঠাকুরদালান দেখতে পেল সে। পাকা দালান কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ। পলেস্তারা অনেক কাল গেছে। এই দূর রাঢ়েও হাওয়ায় এসে নোনা ধরেছে ইটে। থাম গেছে বেঁকে, কোনোটা পড়ো-পড়ো হয়েছে। একটু জোরে ধাক্কা লাগলেই পড়বে। শ্যাওলা ধরে বিবর্ণ হয়েছে, ঘাস গজিয়েছে প্রতিটি ফাঁকে ফাঁকে। ফাটল ধরেছে ছাদে। দেখলে ভয় হয়, কখন ধ্বসে পড়বে। হয় তো দশ বছর আগেও এই ভাঙা দালান পুজোর আগে চুনকাম করা হত। এখন তা-ও হয় না। বিনি পয়সার লোক কালী ভক্তিতে বা ভয়ে শুধু কাটলে গজানো বটের ডাল কেটেছে। শিকড়ের থাবা ওপড়াতে পারেনি।

নতুন শুধু কালীপ্রতিমা। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে দালানের

ভিতরে। সেই অস্পষ্ট আঁধারে, ঘাম তেল-মাখা কালীমূর্তির সারা অঙ্গে যেন ধারালো ইস্পাতের বঁটির ধার। জিহ্বায় রং-এর গাঢ়তায় রক্ত-দর্শনের উল্লাস, পিপাসায় লেলিহান। আকর্ণ অপলক দুই চোখ যেন উগ্র ক্ষুধায় দপদপে। আর সেই বুভুক্ষু, তীব্র দৃষ্টি সর্বত্র ব্যাপ্ত। প্রতিটি মুখে একাগ্র স্থিরতায় হানছে। যেন গোটা বাজসিদ্ধি তার চোখের সীমানায়। অবাক লাগে শুধু মালা-র নরমুণ্ডগুলি দেখে। কেমন যেন চেনা-চেনা লাগে লোকগুলিকে। কাটামুণ্ড মুখগুলি যেন হাসি হাসি। মাথায় বেশ টেরিবাগানো চুল। কারোর কারোর গোঁফ আছে, কারোর নেই। কুমোরও কি চেনা লোকদের মুখ তৈরী করে ঝুলিয়ে দেয় নাকি?

আবার বুঝি মেঘ ঘনায় আকাশে। এক ঝলক শীতার্ত বাতাস ঝাঁপিয়ে আসে মণ্ডপের উঠোনে। কেন যেন কাঠের আগুন জ্বালানো হয়েছে দালানের এক কোণে। ধোঁয়া ওঠে সেখানে। প্রতিমার গায়ে গিয়ে পড়ে। একটুমাত্র প্রদীপের আলো মরো মরো করে। প্রতিমার চালচিত্র কেঁপে ওঠে থর্-থর্ করে। আর মণ্ডপের পিছনের তালগাছটা ধারালো পাতায় একটা চাপা গর্জন শোনা যায় গর্‌র্‌র্ গর্‌র্‌র্ ।

ঢাকীরা বসে আছে ঢাকে হেলান দিয়ে। এখানে ওখানে কয়েকজন সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ রয়েছে বসে। চোখে ওদের ভয় ভক্তি সম্ভ্রম। বুকের ছেলেটা কেঁদে উঠলেও বুকে মুখ চেপে দিচ্ছে। নতুন জামা কাপড় পরে শুধু বড় তরফের ছেলেমেয়েরাই হয় তো একটু ছুটোছুটি করছে। তবু যেন একটা নিশ্চুপ স্তব্ধতা। হয় তো উৎসবের পূর্ব মুহূর্তে এমনি হয়। কিন্তু, ওটা কী? মন্দির? আর একটা মন্দির, যেন মণ্ডপের পিছনেই।

মন্দির দেখলেই তার চোখ শিকারীর মতো তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠছে।

এমন সময় শোনা গেল, ব্যস্ত চাপা গলা: কই, কুথা? হারে গাধা, আমাকে বুইলতে লাগে।

সে পিছনে ফিরে তাকাল। রাজা আসছেন। বড় তরফের

বড় ছেলে, গগনেশ্বর চক্রবর্তী। ধোয়া থান হাঁটু বরাবর। তারই বাকী অংশ এলোমেলো গায়ে জড়ানো। সেই পথে-দেখা বৃদ্ধের মতোই ফর্সা কিন্তু একটু বেশী লাল। পাকা চুলে ধূসরতার চেয়ে তামাটে আভাসই বেশী। মুখের রং একটু উনিশ-বিশ। অতিরিক্ত পান-মেশানো সোনার মতো। মেদ কিছু আছে, কিন্তু বয়স ধরা কঠিন। লাল মাটিতে চলা আর লাল মাটি ঘাঁটা, উপবীতের রং বোধহয় তাই লাল।

এলেন মণ্ডপের পিছন দিক থেকে, কই, কুথা, অ্যাঁ?

খালি গা, মেটে রং, নেংটি-পরা, দুর্গার অসুরের মতো লোকটা আঙুল দেখিয়ে বলল, আঁজ্ঞা অই, অই যি।

ও তাড়াতাড়ি পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। নিস্তরঙ্গ হল কপাল, রেখা হল অদৃশ্য। জীবনধারণের সব চিহ্ন তুলে দিয়ে, নিটোল করে তুলতে চাইল মুখাবয়ব।

গগনেশ্বর বললেন, জয়স্তু বাবা, জয়স্তু। তুমাকে চিনতে পারলাম না বাবা?

ডোমন চক্রবর্তীর চোখ একটু বেশী গর্তে ঢোকা। কিন্তু মণি দুটি চকচকে, একাগ্র স্থির জিজ্ঞাসু।

ও কথা বলল এবার। সংশয় চেপে আর সম্ভ্রমের সুরে বলল, আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমার নাম বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎবরণ গাঙ্গুলি।

—বাঃ, ভাল বাবা ভাল। তুমার বাবার নামখানা কী বাবা?

—শ্রীরামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

—অ! তা' বেশ। আসছ, বেশ করেছ বাবা। কিন্তুক এই দ্যাখো ক্যানে বাবা, আমার মনটো আজকাল বড় বিস্মরণ হয়্যা যায়। তুমার বাবাকে আমি চিনতে লারলাম। কিছু মনে কর না যেন?

চাপা মোটা গলায় তর্-তর্ করে কথা বলেন ডোমন চক্রবর্তী। স্নেহ, ভালবাসা, সারল্যে ও বিনয়ে যেন এক চাষী। কিন্তু একটি আভিজাত্য আছে তাঁর অমায়িকতায়, কথার বাঁধুনিতে। তাঁর

চেহারায় চলনে, খাটো থানে, গৈরিক উপবীতে। বিদ্যুৎ বুঝতে পারল, সন্দেহবশত উনি কিছু বলেননি। অমায়িক প্রশ্নের মধ্যে কোনো অবিশ্বাস-অপমানের কাঁটা নেই। বরং বিচলিত বোধ করছেন, সেটাকে চাপা দেবার জন্য অস্বস্তিতে হাসছেন। সত্যি, ছোট ভাইয়ের শ্যালকের দূর সম্পর্কের ভাই, কলকাতার কোনো এক সওদাগরি অফিসের অবসরপ্রাপ্ত কেরানী রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলিকে তিনি চিনবেন কেমন করে? যাকে কোনোদিন চোখেও দেখেননি। বিদ্যুৎকে দেখেছেন দশবছর আগে। স্মরণ রাখা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

বরং বিদ্যুতেরই একটু দ্বিধা হল পরিচয় দিতে। কিন্তু দিতে হবে। ভুলে গেলেও আত্মীয়তা পাতিয়ে নিতে হবে। বাজসিদ্ধি থেকে সে খালি হাতে ফিরতে পারবে না।

সে বলল, আপনার ভাই হংসেশ্বর চক্রবর্তী আমার পিসেমশায়। আমার বাবা তাঁর খুড়তুতো—

—শালা গ শালা। আ ছি ছি ছি! ই কি বিস্মরণ গ' আমার। আর বুইলতে লাগবেক নাই বাবা, আর বুইলতে লাগবেক নাই। হেঁসো আমার ভাই, তুমার বাবা তার শালা, হা হা হা!

—ভায়ের শালোকে আপুনি চিনতে লারলে বড়্‌কত্তা।

বলতে বলতে, নেংটি-পরা মেটে রং খালি-গা অসুরের মত লোকটা হেসে উঠল। লোকটা এর মধ্যেই কখন ভেজা মাটিতে থেবড়ে বসে পড়েছে। আবার বলল, আপনকার মনটো আজ আমি বেশী খারাপ দেখি গ।

ডোমন চক্রবর্তী নিরীহ সুরে ধমকে উঠলেন, আঃ, তু চুপ কর দেকিন লকা।

লকা খস্‌ খস্‌ করে গা চুলকোতে থাকে। বিড়বিড় করে বলল, ই শালোর গাটো···।

সোনাথড়কে রেখায় চোখ বুজে-যাওয়া হাসি ফুটল ডোমন চক্রবর্তীর মুখে। বিদ্যুতের গায়ে হাত দিলেন, মুখে হাত দিলেন। বললেন, তুমার বাবা ভাল আছেন ত?

জবাবের আগেই বলে উঠলেন আবার, ই দেখ ক্যানে, হেঁসো আসলে না পুজোয়। কতকালের পুজো, সাত পুরুষের উপর। চিঠি দিয়েছিলুম, তার জবাবটা ইস্তক দেয় নাই। আঃ, রাগ হয়েছে আমার উপর। আগে আগে মাসে হু'মণ কর‍্যা ধান কুট্যা চাল করে ঠায়ে দিতুম কলকাতায়। এ বছরটো থিক্যা আর হয়্যা উঠছে না। হুঁ, রাগ করেছে হেঁসো, কালীপুজোয় আসলে না। দেখ ক্যানে বাবা, তুমি আসলে, হেঁসো তার ছেল্যামেয়্যাগুলানকে ·

বাধা পেলেন। অসুরের মতো লকা গা চুলকোতে চুলকোতেই বলে উঠল, হুঁ বড়্‌কত্তা, দিনকালটা বড খারাপ হয়্যা যেইছে। আপুন ভাই ভাইকে বিশ্বাস করে না। বাজসিধিতে আপনার দিন চলে না তাই ছোটকত্তার ভাগটা বেচে দিচ্ছেন, ই-কথাটো—

ডোমন চক্রবর্তীর সোনার জালি জালি মুখে একটি ব্যথা ফুটে উঠছিল। বোঝা যাচ্ছিল, হংসেশ্বর এবং তার ছেলেমেয়েরা না আসায় কষ্ট পাচ্ছেন। আরো কিছু কথা, যা বলতে পারছিলেন না। অথচ অব্যক্ত কষ্টটুকু মুখে ফুটে উঠছিল। কিন্তু অস্বস্তিতে মুখ ফেরালেন লকার দিকে। মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। তার গলায় ফুটল একটি অসহায় বিরক্তি। বললেন, আঁঃ, তু ক্যানে কথা বুলিস, অ্যাঁ ?

বাতাসটা বাড়তে লাগল। সন্ধ্যা ঘনাল, না কি মেঘ জমছে আরো বেশী ? বোধহয় ছুটোই। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে, মেঘও নামছে নীচের দিকে। ছিলে-কাটা সোনার পাতের মতো লম্বা, কালি, মেঘ-গুলি আকার বদলাচ্ছে। রং বদলাচ্ছে। আজকের মহানিশায় ওরা যোগ দেবে যেন। তাই শাল তালের মাথায় এসে ঠেকছে। বেয়ে বেয়ে নামবে মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে।

চমকে উঠল বিদ্যুৎ, কালো কুচকুচে লোকটাকে গায়ের কাছে দেখে। তারপরে, অবাক হয়ে দেখল, সেই সাঁওতাল মাঝিটা। যে এসেছিল তাকে পথ দেখিয়ে। এরকম চমকায় কেন বিদ্যুৎ ? বাজসিদ্ধিতে এসে সে কোনো কারণে চমকাবে না, এই তার পণ।

সাঁওতালটার হাতে ধরা কালো পাঁঠা বাঁধা দড়ি। নাক

কোঁচকানো, চোখ বোজা, গোটা মুখটায় একটা হাসি। সে চীৎকার করে বলল, গড় করি রে বাবু, তুকে আমি লিয়ে আইচি ইসটিশানের রাস্তাটো দেখায়ে, লা কী?

ডোমন বলে উঠলেন, হুঁ হুঁ, তু লিয়ে আসছিস। এখন বস গা যা। এস বাবা, এস।

ডাকলেন তিনি বিদ্যুৎকে।

সাঁওতালটা আবার বলে উঠল, এই বড়্রাজা, ও বাবুটোকে আমি রাজপাখীটোর কথা বুইলছি, লা কী রে বাবু?

ডোমন অবাক হলেন।—রাজপাখী?

—হেঁয় গ, রাজপাখী। সি লবাবের রাজপাখীটো···।

ডোমন চক্রবর্তীর সারা মুখের চামড়ায় একটি তরঙ্গ খেলে গেল। হাত মুঠো করে উপবীত ধরলেন। গর্তে বসা রক্তাভ চোখ দুটি যেন বাইরে উপ্ছে পড়ল। অন্যমনস্ক হলেন এক মুহূর্ত। চাপা চাপা গলায় বললেন, অ! বাজ! বাজপাখী···!

সাঁওতাল বুড়ো হা হা করে হেসে উঠল।—অ্যাই দ্যাখ্, অ্যাই দ্যাখ্ ক্যানে, বড় রাজাটো বিস্মরণ হয়্যা গেল্ছে।

ডোমন আবার ডাকলেন বিদ্যুৎকে, এস বাবা, বাড়ির ভিতরে এস।

—ওই রে বড়্রাজা, তু দ্যাখ্ ক্যানে, ই-বারে কেমন পাঁঠা লিয়ে আসছি।

ডোমন বললেন, দেখেছি রে মাঝি, দেখেছি।

—লা, ভাল কর্যা দ্যাখ্ বড়্রাজা। পাঁঠাটোর অনেক অক্ত, মাকালী খাবে। শুষে শুষে....।

ডোমন ধমকে উঠলেন আঃ।

—চুপ! চুপ!

একজন ঢাকী খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে ভয়ার্ত স্বরে প্রায় আঁতকে উঠল, চুপ কর তু মাঝি। পূজাপাট সব বাকী, তু চুপ যা।

ঢাকীদের মধ্যেই আর একজন কে কাঁপা-কাঁপা চুপি-চুপি স্বরে বলে উঠল, মায়ের বলি লিয়েই কি কথা!

সবাই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রায়ান্ধকার দালানের প্রতিমার দিকে সকলের চোখ। ভয়-ভয়, অপলক চোখে যেন একটা শ্বাসরুদ্ধ প্রতীক্ষা। খেলারত শিশুরাও থমকে গেল। পালাতে লাগল এদিকে ওদিকে।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এবার আরো জোরে এল। তালপাতার তীক্ষ্ণ ধারে বাতাস খান খান হল কেটে। চালচিত্রটা কেঁপে উঠল।

ডোমন আবার ডাকলেন, এস, বাবা এস।

পিছন থেকে লকার গোঙানো গলা শোনা গেল, হঁ, মাঝিটো মিছে কথা বুইলছে। কে খাবেক, তুমি বলবা ক্যানে? হি হি হি ····

হেসে উঠল সে।

দুটি ঘরের মাঝখানের সরু গলি দিয়ে ডোমন চক্রবর্তীকে অনুসরণ করল বিদ্যুৎ। মনে পড়েছে বিদ্যুতের,বার বাড়ি থেকে এই গলি দিয়েই অন্তঃপুরে ঢুকতে হয়। কাঁকর মেশানো লাল মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। মনে আছে বিদ্যুতের। নিচু হয়ে ঢুকতে হয় ঘরে। বড় তরফের এই রাজবাড়ি। বড় তরফ, মধ্যম তরফ, সকলেরই এইরকম। বাজসিদ্ধির রাজবাড়ি তো ইমারত হবে না। বাধা না থাকলে হয় তো ওই ঠাকুর দালানের মতোই বাড়ি থাকত। শ্যাওলা ধরা, ঘাস গজানো, অশ্বত্থের সহস্রমুখ আক্রমণে অন্ধকার, পড়ো-পড়ো ভূতুড়ে বাড়ি।

চারদিকে ঘর। উত্তর-দক্ষিণে, পুব-পশ্চিমে। উঠোনের দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে। আনাগোনা করছে মেয়েরা। কিন্তু বাতি জ্বলেনি এখনো। বোঝা যায়, বৃষ্টিতে উঠোন পিছল হয়ে উঠেছিল। কিছু ছাই আর কাঁকর-বালি মেশানো মাটি ছড়ানো হয়েছে। কোন্ ঘরে যেন শিশু কাঁদছে। বয়স্কা মহিলার ভারি গোলা শোনা যাচ্ছে, 'মেজবউ, ললিতাকে বল দেকিন, দই কুথা আছে, দিতে। আলোচাল কটা মেখ্যা দিই। ঘট সাজাতে আর দেরী সইবেক না।'

বোধহয়, সেই অদৃশ্য মেজবউ-ই ললিতাকে ডাকল কোনো ঘর থেকে, ললিতা কুথা গেল্‌ছিস রে? পিসি ডাকছে।

আর এক ঘর থেকে যেন জবাব এল, যাই।

পরমুহূর্তে সেই গলাতেই যেন হাসি উছলে পড়ল।

সে ঘরে হয় তো অন্য কথা, অন্য আসর বসেছে।

একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ডোমন। গলা খাঁকারি দিলেন। ডাকলেন, তু ইখানে আছিস নাকি স্বপ্নো। এই দ্যাখ্ ক্যানে, কাকে লিয়ে আসছি।

পিছন ফিরে বিদ্যুৎকে বললেন, এস বাবা।

বিদ্যুতের লক্ষ্য পড়ল ঘরের মধ্যে। টিম টিমে প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। সেখানে পূজোর ঘট নৈবেদ্য ইত্যাদি সাজানো হচ্ছে। রাজ-গৃহের পূজোর আয়োজন। যেন একটি অন্ধকার গুহা, দম বন্ধ হয়ে যাবে। কী হত যদি বিদ্যুৎ এদের আতিথ্য না নিত? পরিচয় না দিত? কোথায় বাধা ছিল তার কার্যোদ্ধারে?

তাড়াতাড়ি জুতোর ফিতে খুলতে থাকে সে। ভুল ভাবছে। বিরক্ত হয়ে, এলোমেলো চিন্তা করছে সে। পরিচয়বিহীনভাবে কোনো গ্রামে ঢোকা যায় না। ঢুকলে, কার্যোদ্ধার হয় না। সহসা কারুর সামনে পড়ে পরিচয় দিতে না পারলে সন্দেহভাজন হয়ে পড়তে হবে। শুধু পরিচয় নয়। পরিচয়ের পরেও, এ গ্রাম যখন একেবারে ঢলে পড়বে, এ বাজসিদ্ধির পশু ও মানুষ, সব যখন অচৈতন্য হয়ে পড়বে, একমাত্র তখনি সেই পরম লগ্ন আসবে।

আর সেই পরম লগ্ন বাজসিদ্ধির জীবনে একদিনই আসে। কাল সেই দিন, আগামীকাল। হোক-না অন্ধকার দমবন্ধ ঘর। নরক হলেও ক্ষতি কী ছিল। সে এসেছে তার সিদ্ধবস্তুর সন্ধানে।

জুতো খুলে রেখে, ডোমন চক্রবর্তীর পিছু পিছু ঘরে ঢুকল সে। পুজো পুজো গন্ধ ঘরটার মধ্যে। কলা, আখ, নারকেল রেড়ির তেলের প্রদীপের ধোঁয়া, গুড়, বাতাসা, সব মিলিয়ে পুজোর গন্ধে বাতাস ভারি। একদিকে বড় চৌকি। তাতে বিছানাপত্র এলোমেলো।

আধো অন্ধকারেও টের পাওয়া যাচ্ছে, কে যেন মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সেখানে। আর একদিকে কয়েক মাসের একটি শিশুও হাত পা ছড়িয়ে অকাতরে নিদ্রিত। মেঝেয় মাটির ওপরে দুজন মহিলা পুজোর আয়োজন করছেন। একজনের আবক্ষ ঘোমটা। আর একজনের ঘোমটা সরানো।

যার ঘোমটা নেই, তাকেই বললেন ডোমন, ই দ্যাখ স্বন্নো, কলকাতার রামকিষ্টবাবুর ছেল্যা। রামকিষ্ট গাঙ্গুলি, আমাদিগের হঁসোর শালার ভাইপো।

বিদ্যুৎকে বললেন, ইয়াকে তুমি চেন,আগের বারে দেখেছ, আমার বুন।

বিদ্যুৎ নিষ্কলুষ হাসল একটু লজ্জা লজ্জা ভাবে। মনে পড়েছে তার এঁকে। অন্য পাড়ায় বাড়ি। পুজো উপলক্ষেই এসেছেন নিশ্চয়। বলল, হ্যাঁ, চিনি আমি।

সে ঝুঁকে পড়ল প্রণাম করবার জন্যে। স্বর্ণ সরে গেলেন।—থাক বাবা, থাক, পূজাপাটের কাজ লিয়ে রইচি, অখুন থাক।

অর্থাৎ ছোঁয়াছুঁয়ি চলবে না। সকলের একই রকম কথা। কেমন একটি বিচিত্র সুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কথাগুলি অসঙ্কোচে বেরিয়ে আসে। লাল মাটি আর পাথরের, কোমলে কঠিনে মেশানো কথা গুলির মধ্যে একটি মাধুর্য যেন আছে। কেবল কলকাতার চোখে মানুষ গুলির বেশবাস চেহারার সঙ্গে কথার যেন কোনো মিল খুঁজে পায় না।

স্বর্ণ বললেন, একটো খবর টবর দিতে লাগে? গরুর গাড়ি পাটায়ে দেয়া যেত। ইস্টিশন থিক্যা হেঁট্যা হেঁট্যা আসতে হঁয়েছে ত?

বিদ্যুৎ বলল, তাতে কি?

—কলকাতায় থাক, তুমাদিগের কি এত হাঁটাচলা আছে বাবা?

এই রকমই ভাবে গ্রামের লোকেরা। কলকাতার লোককে এরা চোখে দেখেছে। চেনে না। জানে না কলকাতাকে। জানে না, কলকাতার লোকের হাঁটবার সময় নেই। তাকে ছুটতে হয়।

উদয়াস্ত তাকে ছুটতে হয় তাড়িত পশুর মতো। থামে না সে। থামলেই তাকে মরতে হবে।

স্বর্ণ আবার বললেন, পেত্থম যখন আসছিলে, আমার মনে আছে। তখন কলেজে পড়তে। অখুনও কি পড়া চইলছে ?

বিদ্যুৎ যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। বলল, না, বি. এ পাশ করে আর হয়নি। টাকা পয়সার অভাব হল।

ডোমন আর স্বর্ণ একই সঙ্গে বলে উঠলেন, অ' আহা !

ডোমন বললেন, ভাল ছেল্যা, বেশ ছেল্যা। দ্যাখ দেকিন, কলকাতা থিক্যা কত কষ্ট করা আসছে। আর ঘরের ছেল্যা হেঁসো আসলে না।

স্বর্ণ যেন হংসেশ্বরের কথা আলোচনা করতে চাইলেন না। ডোমনকে বললেন, একে লিয়ে পচির ঘরে যাও দাদা। বসাও। পাঁচুকে বল হাত মুখ ধুবার জলটল দিক। আর আভা কুথা গেলছে ? তাকে বল ক্যানে, জলখাবার দিক। চা করুক।

ডোমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—হঁ হঁ, এস বাবা, তুমি এস।

বিদ্যুৎ বেরিয়ে এল ডোমনের সঙ্গে। ডোমন হাঁকডাক সুরু করলেন, এই, কে আছিস রে ইদিকে। পচির ঘরে একটো বাত্তি দে। আভা কুথা গেলি। অই ললিতা, দ্যাখ্। ক্যানে, ইদিকে একবার আয়। কলকাতার রামকিষ্ট বাবুর ছেল্যা আসছে। মেজ বৌমাকে বল্। পাঁচু—এই পাঁচু ! হারাঁমজাদারা যায় কুথা গ ?

বিদ্যুৎ বুঝল সে গৃহীত হয়েছে। সম্মানীয় এবং স্নেহভাজন অতিথি হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। সুরুটা শুভ। কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। সে বলল, থাক না, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

ডোমন বললেন, কখুন বার হয়েছ, পথে ঘাটে কত কষ্ট গেলছে। আগে হাত মুখ ধুয়্যা বস। তা' পরেতে—।

উঠোনে কারা যেন এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেলে দেওয়া কাপড়ের আড়ালে আবডালে। আর অন্ধকার একটু গাঢ় হয়ে এসেছে এর মধ্যে। হয় তো মেয়েরা বিদ্যুৎকেই লক্ষ্য করছে।

ডোমন চক্রবর্তীর ডাক শুনে সে বুঝল, পাঁচু চাকর। মেজ বউ, এ তরফের মেজকর্তা রামেশ্বরের স্ত্রী। মনে আছে বিদ্যুতের। ললিতা তার মেয়ে। দশ বছর আগে তাকে সিকনি লাঞ্ছিতা, ফ্রক পরিহিতা দেখে গেছে। ডোমন চক্রবর্তী বিপত্নীক। তাঁর এক ছেলে। কাছে থাকে না। বার্নপুরের লোহা কারখানায় কাজ করে। সেও কাকার রাস্তা ধরেছে। ত্যাগ করেছে বাজসিদ্ধি। বাজসিদ্ধির সমস্ত সংশ্রব, হয় তো বাপকেও। বাজসিদ্ধির রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা বোধহয় বার্নপুরের কারখানার লোহার মতো কঠিন।

হংসেশ্বরের কথা বললেন ডোমন চক্রবর্তী, ছেলের নাম উচ্চারণ করেননি। তাঁর শপথ হয় তো রাজার শপথ। এসব বিদ্যুতের আন্দাজ। আর আছে তাঁর চার মেয়ে। সকলেরই বিয়ে দিয়েছেন। হয় তো তাদের দু'একজনকে বিদ্যুৎ অবিবাহিতা দেখেছে দশ বছর আগে।

একটি মেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। হাতে তার বাতি। পুরনো সেকেলে বেঁটে চিমনীর হ্যারিকেন। বাজসিদ্ধির খাস প্রজা ঝালাই মিস্তিরির হাতে যাকে অনেক ঘা খেয়ে, ফুটো বুজিয়ে বাঁচতে হয়েছে।

মেয়েটি বড়। বয়সের চেয়ে বোধহয় চেহারায়। চিন্তাভাবনা-হীনার মত বিশাল বপু নয়। দীর্ঘ আর গ্রামের অযত্নে লালিত গাছের মতো শ্যাম পুষ্ট। কাঠামোয় একটি ঔদ্ধত্য আছে। নম্রতার আবরণে তা ঢাকা। চোখ দুটি বড়, সুন্দর। কিন্তু বিদ্যুতের মনে হল, ভাল নয়। বড় বেশী দূরগামিনী দৃষ্টি। এসব চিনতে তার অসুবিধে হয় না। মেয়েটির চোখে যেন অনেক তল-দেখা গভীরতা। আর সেটি এক শান্ত মৌন মগ্ন নিস্তরঙ্গতায় স্নিগ্ধ। অনেক বাজ-চোখের থেকে এ চোখ বিপজ্জনক। চুল টেনে আঁচড়ানো, কপালে একটি টিপ। হ্যারিকেনের আলোয় কালো কিংবা খয়েরী টিপ, বোঝা যায় না।

ডোমন বলে উঠলেন, আই যে আভা, আরে, তুরা সব কুথা রইচিস। অতিথ কুটুম আসছে, একটু দেখাশোনা করতে লাগবেক

কী? ই তাখ্, কলকাত্তা থিক্যা আসছে, আমাদিগের কুটুম। তু চিনতে লারবি, রামকিষ্টবাবুর ছেল্যা।

বিদ্যুৎকে বলেন, ই মেয়্যাকে তুমি চিনবেক নাই বাবা। ই আমাদিগের রামেশ্বরের শালীর মেয়্যা। ছুঁড়ির কপালটো বড় খারাপ। বাপটো নিরুদ্দেশ, মাটো মারা গেলছে। সাত কুলে কেউ নাই, ইখ্যানেই আছে। তুমকার স্কুলে পডছিল, কিন্তুক—

কথা শেষ হবার আগেই চমকে উঠে বিদ্যুৎ দু'পা পিছিয়ে গেল। —না, না।

আভা পায়ে হাত দিতে আসছিল। এ সবে অনভ্যস্ত নয় শুধু, খারাপ লাগে বিদ্যুতের। কুঁকড়ে ওঠে সে। আর যুগপৎ রাগে এবং বিদ্রূপে সে অস্থির হয়ে ওঠে। একটা অবিশ্বাস্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা, এদেশে যার দাম ফুরিয়েছে অনেককাল। কিংবা হয়তো আরো কিছু আছে, যা সে ব্যক্ত করতে পারে না। কিন্তু শিউরে ওঠে তার গায়ের মধ্যে। প্রণাম নেওয়া দূরের কথা, নিজের বাবাকে প্রণাম করতে চিরদিন লজ্জা করেছে। কৈশোরের লজ্জাটা এখন পরিণতি পেয়েছে বিক্ষোভে। নিরুপায় স্বজনেরা তাই ঠাট্টা করে বলে, সূর্যবংশীয় রাজা হলি নাকি?

ডোমন আর স্বর্ণকে সে প্রণাম করেছে, সেই তার প্রথম অস্ত্র। সংসারটা দিনে দিনে কঠিন হয়েছে যত, ঠুনকো নিয়মগুলিকে সে জীইয়ে রেখেছে তত। তাতে মুগ্ধ হতে, তুষ্টি পেতে চেয়েছে। যে উদ্দেশেই সে এসেছে, সেই উদ্দেশেই নমস্কার। আর সেই উদ্দেশেই, আভাকে বাধা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই, লজ্জা আর সংকোচের ছদ্মবেশ দিয়ে ঢেকে ফেলল সে নিজেকে। বলল, থাক্ না।

ডোমন বলে উঠলেন, থাকবেক ক্যানে বাবা। তুমি বড়, বিদ্বান।

বড়! বিদ্বান! তার উল্টনো ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে উঠল। তিক্ত ফেনিলোচ্ছল হাসিটা তার বুকের অন্ধকারে চেপে রাখল। হ্যাঁ, সে গ্রামে এসেছে, বুঝতে পারল। বুঝল সেকেলে লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে। এখানে যারা, মানুষের বয়সের প্রবীণত্ব এবং বিদ্যার

বিশ্বাস করে। বিদ্যুৎদের শহর কলকাতায় যে বিশ্বাস অনেককাল আগেই প্রবীণ আর বিদ্বানরাই খেয়ে হজম করেছে।

তবু সে নিখুঁত হল ছলনায়। তার চোখের কোণের বিদ্রূপকে একটি সঙ্কটজনক লজ্জার হাসি দিয়ে ঘিরে রাখল। আভা তাই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আভাকে বললেন ডোমন, যা, পচীর ঘরে লিয়ে বসাগা বিদ্যুৎকে। পাঁচুকে বল জলটল দিক, আর—

সেই মুহূর্তেই বাইরের বাড়ি আর ভিতরের গলির মোড় থেকে গলাটা ভেসে এল, আই গো বড়কত্তা, গতিক সুবিধের নয় কিন্তুক।

বিদ্যুৎ দেখল, ডোমন চমকে উঠলেন। তাঁর অন্ধকার চোখ দুটি প্রসারিত বিদ্যুতের দিকেই। যেন গলির দিকে ফিরে তাকাতে ভরসা পেলেন না। আর বিদ্যুৎ নেই তাঁর চোখের সামনে। বিদ্যুতের ভিতরে আর কাউকে যেন দেখলেন হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয়। সোনালী রেখাগুলি ওলটপালট হয়ে একটি আতঙ্কের চিহ্ন এঁকে দিল সারা মুখে। শুধু বললেন, অঁা?

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুতের নাকে আবার গন্ধটা লাগল। শব্দটা ডোমন চক্রবর্তীর একেবারে ভিতর থেকে বেরুল। তাই পেল বোধহয় বিদ্যুৎ। কিংবা এর আগে ঠিক মনোযোগ দিতে পারেনি বলে সংশয় ছিল। ডোমন চক্রবর্তী মদ খেয়েছেন।

অন্ধকারের ভিতর থেকে লকার অসুর অবয়বটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। শোনা গেল, এসে পড়লে যে বড়কত্তা, রোখা যেইল না?

ডোমনের এক ভাব। শুধু গলার নাড়িগুলো কাঁপল। গলার স্বর কাঁপল, নিচু হল আরো। প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, কে? অঁা?

—বুনি গ, বুনি লামছে। খোলা-উঠোনে রইচেন, ট্যার পান নাই? পঁচি-বাতাস ছাড়ছে, বিষ্টি আসবে মনে লিচ্ছে।

ডোমন ফিরে তাকালেন লকার দিকে। শান্ত হয়ে চাইলেন।

—অ!

লকা বলল, হঁ, ঠাকুরদালানের পেছু দিকটো সামলাতে হবেক।

—অ !

একটি নিঃশ্বাস ফেললেন ডোমন। যেন আঁকুপাঁকু করছিল তাঁর বুকের মধ্যে। আবার বললেন, অ ! তাই বল্ ক্যানে।

বিদ্যুৎ বুঝল, পশ্চিমা বাতাসের কথা বলছে লকা। এটা কেমন যেন অশুভ লাগছে। মেঘ গাঢ় হচ্ছে ক্রমে। বাতাস থামছে না। কালো মেঘগুলি যেন শরীরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াচ্ছে। যদি বিষ্টি আসে, যদি ঝড় আসে, তা হলে ? আজকের রাতটা না হয় হল। কাল ? কাল সারাদিন এবং রাত্রেও যদি না ছাড়ে ?

এখন ভেবে লাভ নেই। সময়ের হাতে ওটা ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ডোমন চক্রবর্তী এমন চমকালেন কেন ? ভয়ে এত অসহায় হয়ে পড়লেন কেন ? কে আসবে ? কার প্রতীক্ষা করছেন তিনি ?

ডোমন চক্রবর্তীই আবার বলে উঠলেন, চ' চ' চ', দেখচি কি ব্যবস্থা হয়।

বিদ্যুতের দিকে ফিরে বললেন, কথা বলবার যো নাই বাবা, বসবার উপায় নাই। যাও, ঘরকে যাও ! অই, আভা, লিয়ে যা, লিয়ে যা—

ডোমন অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলেন। লকা বলতে বলতে গেল, রাতটো মা কালী হয়্যা যেইছে গ !

একটা ছাগল ডেকে উঠল। হয় তো বলির পাঁঠা।

ছাগল ডাকলেও নাকি বিষ্টি আসে ?

—আসুন।

এতক্ষণে যেন একটা স্বাভাবিক উচ্চারণ শুনল বিদ্যুৎ। আভা বাতি তুলে ডাকল তাকে। পশ্চিমের ঘরে নিয়ে যাবে। এক ডাকে ওর কথার পরিচ্ছন্নতা টের পাওয়া যায়। হয়তো চরিত্রেরও।

ঘরে ঢোকবার আগেই প্রায় ছুটতে ছুটতে এল ললিতা। আর বাধা দেবার আগেই সে বিদ্যুতের পায়ের কেডস দুটি খুঁটে নিয়ে কপালে ছোঁয়ালে। বললে, জ্যাঠামশায়ের কথাগুলো কানে যেইছে, কিন্তুক আসতে পারছি না। কী যে যন্তন্না না !

গিন্নির মতো কথা বলছে ললিতা। কিন্তু একটি সলজ্জ হাসি ফুটল তার মুখে। চোখাচোখি করল আভার সঙ্গে। আভার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু হাসি চাপল। বিদ্যুৎ দেখল, ললিতার কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর। ঠোঁটে পানের ছোপ। শরীরে একটি অস্বাভাবিক স্ফীতি। বিদ্যুতের হিসেব অনুযায়ী কত বা মেয়েটির বয়স। বছর সতেরো হতে পারে। পরমুহূর্তেই সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তার চোখ, ঠোঁট কুঁচকে উঠল। মনে মনে সে অশ্লীলভাবে উচ্চারণ করল—বাঘ-ছোঁয়া আঠারোর ঘা লেগেছে ললিতার।

ললিতা বলল, সি কত ছেলেমানুষ বয়সে আসছিলেন, আমার মনে আছে। ছোটকাকার ছেলা৷ বিশুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা বেড়াতেন।

অর্থাৎ হংসেশ্বরের ছেলে। বিশু তার সমবয়সী ছিল। তার টানাটানিতেই তখন বাজসিদ্ধিতে এসেছিল বিদ্যুৎ। বাজসিদ্ধির রাজাদের বড় তরফের ছোটকর্তার ছেলে সে। কলকাতায় সিনেমা দেখতে, বিড়ি খেতে এবং বেড়াতেই ভালবাসত। অশ্লীল গান আর অচেনা মেয়েদের অনায়াসে চোখ মারতে পারত। আর কথা বলত বাজসিদ্ধির ভাষাতেই। শুনেছে হংসেশ্বর তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন কোথায় আছে, কেউ জানে না।

হায় বাজসিদ্ধির রাজবংশের ছেলে !

বিদ্যুৎ বলল ললিতাকে, তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ। বিয়ে হয়ে গেছে দেখছি।

ললিতা হাসল। চোখাচোখি করল আভার সঙ্গে। বলল, এই দ্যাখেন ক্যানে। কিন্তক আপনার গলাটো কি মোটা শোনাচ্ছে বিদ্যুৎদা।

কিন্তু এসব আলোচনার কি সময় আছে বিদ্যুতের। সামাজিকতা, কুশল সমাচার সবই তো ভান মাত্র। কখনো দায়ে পড়ে, কখনো অভ্যাসের বসে লোকে ও ব্যাপারগুলি করে। বিদ্যুৎকে এখন দায়ে পড়ে এসব করে যেতে হবে।

ললিতার বিয়ে হয়েছে। বাজসিদ্ধির কত লোক দশ বছরে মরে

গেছে। ললিতাও না থাকতে পারত। কি আসত যেত বিদ্যুতের। একটু আগেই ডোমন চক্রবর্তীর ভাবান্তরে কৌতূহল বোধ করছিল সে। কেন? কি আসে যায় বিদ্যুতের? বরং এই রাত্রিটা তাকে ভাবাচ্ছে। এই রাত্রির রূপান্তর। এই রাত্রেই সে একবার সুযোগ নিতে চায়।

ললিতার মা এলেন এসময়ে। বয়সে প্রৌঢ়া, কিন্তু ঘোমটা কপাল পর্যন্ত। কথা বলেন ফিস্‌ফিসিয়ে। যেন ভাসুরঠাকুরের অস্তিত্ব কোনো সময়েই ভুলতে পারছেন না। সেই একই কথা বলেন, বড় খুশি হয়েচি বাবা তুমাকে দেখে। কাজ কামের তাড়া, দুটা কথা বলবার সময় নাই। যাও, বসগা।

একটা প্রণাম করতে হয় বিদ্যুৎকে। মেজবউ বলেন, আহা, সোনার টুকরা ছেল্যা।

বিদ্যুৎ মনে মনে বলল, মারাত্মক লোক এরা। শুধু গুণ গায়। শুধু স্নেহ করে। আর বিশ্বাস করে। যেন এরা একালের লোক নয়। কিংবা সবটাই ভান। শহরের সেইসব ঘাগী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মতো।

মেজবউ আবার ললিতাকে বলেন, ঠাকুরঝিকে তু দইয়ের হাড়িটা দিয়ে আয় ক্যানে ললিতা। কখুন বুইলচে।

ললিতা বলে উঠল, তাই না বটে গ।

বলেই সে অদৃশ্য হল। চলে যেতে, মেজবউ বললেন, আমি যাই, চা করিগা।

আভার পিছনে পিছনে বিদ্যুৎ পশ্চিমের ঘরে মাথা নিচু করে ঢুকল। আভা বলল, এ ঘরের পিছনে জল আছে। চলুন হাতমুখ ধুয়ে-আসবেন।

দরকার ছিল না এসবের। কিন্তু এসব নিয়মকানুনগুলি মানতে হবে। বলল, হ্যাঁ, চলুন।

বিদ্যুৎ দেখল, আভা বিস্মিত হয়ে তাকাল। তারপর একটু হেসে চোখ নামাল। বলল, আপনি করে বলছেন নাকি আমাকে?

সলজ্জ কিন্তু সপ্রতিভ ভাবে বলল আভা। ওটা বিদ্যুতের অভ্যাসের ভুল। স্থানবিস্মৃতি। একটি যুবতীর সামনে যুবোচিত

লজ্জার ধার ধারল না সে। বলল, ঠিক বুঝতে পারিনি, ভুল হয়ে গেছে। চল, তা হলে একেবারে হাতমুখ ধুয়েই আসা যাক।

চোখ তুলল আবার আভা। ও চোখ ভালো নয়। বিদ্যুৎ মনে মনে বলল। আর বুঝল, কেন ওর চোখ বহুদূরগামিনী। ওর কেউ নেই, পরের বাড়িতে মানুষ, তাই পা বাড়াবার আগে সকলের ভিতরটা দেখে নিতে চায়।

আভা একটি গামছা পেড়ে নিল ঝোলানো বাঁশ থেকে। বলল, কাপড় ছাড়বেন না?

বিদ্যুৎ তখন ঘরটা দেখছিল। চৌকি পাতা, ময়লা বিছানা, গন্ধেই টের পাওয়া যায়। শহরতলীর সেলুনের মতো মাটির দেওয়ালে পুরনো ক্যালেণ্ডারের ছবিতে ভর্তি। বলল, থাক, পরে দরকার হলে ছাড়ব।

আভা বাতি নিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হল। বিদ্যুৎ অনুসরণ করতে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়াল। আভা দাঁড়িয়ে পড়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বলল, ব্যাগটা কাঁধে থাকলে হাত-মুখ ধুতে অসুবিধে হবে না?

বিদ্যুতের চোখের চারপাশে হিজিবিজি বূ্যহ গভীর হল। আভার ঠোঁটের কোণে হাসি লুকিয়ে আছে নাকি? ছায়াচ্ছন্ন আর নিস্তরঙ্গ জলের মতো শান্ত চোখ। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন খচখচিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। ছায়া ভরা নিস্তরঙ্গ জলের মতো চোখে থেকে থেকে রোদের ঝিলিক লাগছে নাকি।

বিদ্যুৎ হাসবার চেষ্টা করে বলল, ভুলে গেছি।

ভুলে গেছে, তবু প্রাণ ধরে কাঁধ থেকে নামাতে চায়নি। ভুলেও যদি কেউ খুলে ফেলে? জামা নেই, কাপড় নেই ব্যাগে। যা আছে তা কোনোক্রমেই দেখানো চলে না। তার সিদ্ধবস্তু সংগ্রহের অস্ত্র আছে। ধারালো অস্ত্র আর তরল আগুন!

ব্যাগটা নামাতে হল তাকে কাঁধ থেকে। আভা হাত বাড়িয়ে দিল। কাচের চুড়ি-পরা পুষ্ট শক্ত হাত। বলল, দিন, রেখে দিই।

বুকের মধ্যে নিঃশ্বাসটা কেমন আটকে গেল বিদ্যুতের। তীক্ষ্ণ

চোখে দেখল আভাকে। ভাববার সময় নেই। যদি টের পায় কোনোরকমে?

ব্যাগটা তুলে দিল সে আভার হাতে। দিয়ে আভাকে লক্ষ্য করল। মাটির দেয়ালে গাথা একটি কঞ্চিতে ঝুলিয়ে ব্যাগটা রেখে দিল আভা। তারপর বাতি নিয়ে অগ্রসর হল।

বাইরে অন্ধকার আরো ভারি হয়েছে। আকাশে একটিও তারা নেই। প্রায় টের না পাওয়ার মতো দু-এক ফোটা বৃষ্টি এসে লাগছে মুখে। ঘরের পিছনে জলের বালতি আর ঘটি রয়েছে। লাল কাদা মাখা কাঠের পাটাতন। কোনোরকমে একটু জল ব্যয় করতে হবে। কিন্তু আভা দাড়িয়ে রইল বাতি নিয়ে। অস্বস্তি হচ্ছে বিদ্যুতের।

—জল ঢেলে দেব?

সাগ্রহ গলা শোনা গেল আভার।

কি চায় মেয়েটি। কাছে আসতে চায়, না শুধ সম্ভ্রম। বিদ্যুৎ বলল, না থাক।

হাত-মুখ ধুয়ে মুখ ফেরাবার আগেই আভা গামছাখানি বাড়িয়ে দিল। বিদ্যুৎ চোখাচোখি করল না। ঘরের দিকে পা বাড়াল। এবং ঘরে ঢুকে প্রথমেই ব্যাগটার দিকে লক্ষ্য করল। আছে। যেমন রাখা ছিল, তেমনি আছে।

বাতিটি রেখে আভা অদৃশ্য হল। খুশী হল বিদ্যুৎ। একটু একলা হতে চাইছিল সে। নিজের সঙ্গে একবার মুখোমুখি করতে চাইছিল। ঘরের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঘরের একটি অংশ অন্ধকার হয়ে গেল তার ছায়া পড়ে। আর সেই মুখটি ফিরে পেল সে। শেষ চড়াই থেকে বাজসিদ্ধিকে দেখা সেই চোখ, তীক্ষ্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কুটিল। শহরের মার-খাওয়া, হাতে-গড়া মুখটা তার, শক্ত চোয়াল আর জীবনধারণের ছুরি-বসানো কঠিন রেখায় আসল রূপ ফিরে পেল।

পরিচয় হয়েছে। আশ্রয় পাওয়া গেছে। এবার কাজ। এখন থেকেই সুরু না করলে, দেখতে দেখতে সময় চলে যাবে। কিন্তু রাতটা অশুভ হয়ে উঠছে। দুর্যোগ যেন তার পায়ে পায়ে এল

বাজসিদ্ধিতে। কার্তিকের বর্ষা, তাও ধরন হয়েছিল। এমন কালো কুৎসিত মেঘ যেন গায়ের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলছে বাতাসের ঝাপটায়। পাতার চালায় তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। যেন চালার ওপর দিয়ে কেউ চুপি চুপি যেতে গিয়ে মস্‌মস্‌ করে শব্দ করছে।

কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যে সঠিক স্থানটি জানা দরকার। অন্তত জানতে পারলে ভাল হয়। কেননা, পরবর্তী পদক্ষেপ তার ওপরই নির্ভর করবে। চেষ্টা করতে হবে আজ রাত্রেই।

বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি দেয়াল থেকে ব্যাগ নামিয়ে খুলে ফেলল। আগে বের করল ছোট্ট টর্চলাইট। পকেটে রাখল সেটা। তারপরেই একটি শিশি তুলে সে দেখল। অ্যাসিডের শিশি। খুব সাবধানে মুখ সীল করা। দরজার দিকে ফিরল বিদ্যুৎ। তাড়াতাড়ি অ্যাসিডের শিশিটি ব্যাগে রাখতে গেল। থেমে আবার পকেটে রাখল সাবধানে। যদি মুখ খুলে যায় শিশির, তাহলে বাজসিদ্ধির ঐ কাঁদরের ধারে শ্মশানেই শেষ আশ্রয় নিতে হবে। তবু পকেটে রাখতে হল। নিয়ে বেরুনোই ভাল। যদি কাজে লেগে যায়।

আর যদি কার্য সিদ্ধি হয়। যদি হয় নয়, করতে হবে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে প্রথমেই সেই লোকের কাছে যাবে। যে তাকে এ সন্ধান দিয়েছে। যে তাকে বহুদিন আশা দিয়েছে, অনেক ঘুরিয়েছে। সেই ঈশান ব্যানার্জীর হাতে তুলে দেবে। যে ঈশান ব্যানার্জীর গায়ের মাংস তুলোর মত তুলতুলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। কিন্তু মুখে রেখা নেই। সুগোল, স্ফীত, রক্তাভ মুখ। রেখাবর্জিত কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব যে পার হতে চলেছে, সেটা বোঝা যায়। ছোট দুটি চোখে সে ফিরে তাকাবে। আপাত নিরাসক্ত সেই পাথরের মতো যে চোখ দুটিতে আর কোনো ভাবের খেলা খেলে না।

সেই জিনিসটি যখন ঈশানবাবুর হাতে তুলে দেবে, তখনো হয় তো সে নির্বিকার ভাবে গোঙানো নীচু গলায় বলবে, এনেছ? বেশ, দেখি?

দেখে একটি হুঁ দিয়ে বলবে, হ্যাঁ, এইটেই। রেখে এস দোতলায় আমার লাইব্রেরীতে।

রেখে যখন ফিরে আসবে বিদ্যুৎ, হয়তো ছোট্ট একটি চিরকুট দেবে তার হাতে। বলবে, যার নাম লেখা আছে, তার কাছে যাও। চাকরি একটা পাবে।

চাকরি! একটা চাকরি! মৃতের পুনর্জীবন। যার শেষের শেষ কথা। যা কিছু আছে আজকের মানুষের জীবনে। হাসি এবং কান্না আর অপমান ও দুঃখ এবং সুখ আর ইচ্ছা ও চেষ্টা।

যখন খুশি তখনই ঈশান ব্যানার্জী দিতে পারত এমনি একটি চিরকুট। যখন খুশি, যে কোনো মুহূর্তে। রাত দুটোয় হলেও আটকাত না। ইচ্ছে হলেই পারত। কিন্তু খয়রাতিতে তার বিশ্বাস নেই। দয়াতে আস্থা নেই। প্রতিদানে সে বিশ্বাসী।

ঈশান ব্যানার্জী পণ্ডিতকুলের শিরোমণি। বঙ্গদেশের সংস্কৃতির সুউচ্চ চূড়ায় তার বাস। সবাই আছে তারই আসনের নীচে। বিদেশের জাদুঘর আর চিত্রশালা ঈশান ব্যানার্জীর সাহায্য ব্যতীত আজ আর ভারতীয় বিভাগগুলি নিশ্চয় রক্ষা করতে পারত না। বাড়াতে পারত না ভারতীয় সংস্কৃতির উপাচার।

ঈশান ব্যানার্জীর বিত্ত রূপকথার গল্পের মতো। ঈশান ব্যানার্জীর শক্তির কাছে অনেক উঁচু মাথা নত। হেতু খুঁজলে অথৈ জল। অনেক রহস্যের উদ্ধার হয়। কিন্তু ঈশান চিররহস্যে ঢাকা।

চার বছর আগে, প্রথম বিদ্যুৎ ঈশানের দূর-সান্নিধ্য পেয়েছিল। সামান্য কিছু অনুবাদের কাজ পেয়েছিল সে। কিছু বিদেশী গেজেটিয়ারের বাংলা অনুবাদ দরকার পড়েছিল তার। কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল একজন। পয়সার পূর্ব শর্ত কখনো নড়ে না চড়ে না। তবু শিক্ষিত বেকারদের দশ রকম উঞ্ছবৃত্তি করে দিন কাটাবার কাজের মধ্যে পড়ে এসব।

কিন্তু দশ রকম দূরে থাক। সেই একমাত্র উঞ্ছবৃত্তি জুটেছিল বিদ্যুতের। আর চার বছর ধরে, সমুদ্রের ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে

বারে বারে তাকে সেই এক ঈশানের কূলেই মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে। সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলা নিয়মে সে বাঁধা পড়েছিল। কখনো অনুবাদ, কখনো নকলনবীশি, কখনো শুধ বই ঘাঁটা আর রেফারেন্স টোকা। চার বছরের আটচল্লিশ মাসের হিসেবে হয়তো গড়পড়তা মাসিক দশ টাকাও নয়।

তবু, তবু এই দিনগুলি। রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি বাঘের মতো বসে আছেন বাড়ির দোরগোড়ায়। শিক্ষিত ফাঁকিবাজ এই ঔরসজাত শয়তানকে নাকি বিলক্ষণ চেনেন তিনি। কুকুরের মতো বিদ্যুৎ বাড়ি ঢোকে কোন্ লজ্জায়? কে তাকে মরতে বারণ করেছে। খবরের কাগজের প্রতি এত অকৃপণ কেন সে? সে গলায় দড়ি দিলে একটি ছোট শিরোনামাই মাত্র ছাপা হতে পারে। 'বেকারের আত্মহত্যা।'

আশ্চর্য। ছেলেমানুষি গেল না বিদ্যুতের। এই গুহার মতো ঘরটায় দাঁড়িয়ে, এসব ভাবতে তার বুকটা টাটাচ্ছে। এখনো টাটায়। সে সরে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে।

এই সময়গুলিতে কলকাতার সঠিক হাত তার মুখ তৈরী করছিল। তার চরিত্র তৈরী করছিল। রাগের চেয়ে বাবাকে ঘৃণাই করেছে সে বেশী। কারণ তার নিজের বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিকে সে ঘৃণা করেছে তার চেয়ে বেশী। গত সপ্তাহেও সে আতঙ্কে মাইলের পর মাইল কলকাতার রাস্তায় হেঁটেছে। ছুটেছে প্রায়।

আর তারপরেও উল্টোডাঙায় ছুটে গেছে সে। অবিশ্বাস্য। তবু কী বিচিত্র ক্ষুধা মানুষের প্রাণে। সেখানে মীনাক্ষী, মীনাক্ষীরা থাকে। কী একটা লগ্নে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কী একটা ক্ষণে মাত্র এক বছরের আয়ু নিয়ে কলকাতার এক তৃতীয় শ্রেণী কলেজে পড়তে এসেছিল।

বুকে হয় তো আর তাপ নেই মীনাক্ষীর। হাতে শক্তি নেই। ডাক দেবার মতো চোখ নেই। তবু ওর কাছেই বারে বারে ছুটে গেছে বিদ্যুৎ। তাপ সঞ্চার করে নিতে চেয়েছে। একটি শেষ তৃণকুটা আঁকড়ে ধরার অন্তিম আশার মতো, রুষে ফুঁসে যেন বুকের

মধ্যে টেনে নিয়েছে। দেহের শিরায় রোমান্টিক কাঁপুনিগুলি বিদায় নিয়েছিল অনেক আগেই। বোধহয় দুজনেরই। শেষ বিপদটাকে কাঁচকলা দেখিয়েছিল ওরা। রক্তহীন ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটি মীনাক্ষীর শুষে শুষে, বোধহয় বারে বারে বোঝাতে চেয়েছে, বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।

আর মীনাক্ষী। যার সব গিয়েও কিছু একটা ছিল। জলে ডুবিয়ে দেওয়া বলের মতো ভেসে উঠেছে আবার। কোনোরকমে দম নিয়ে হেসে বলেছে, 'শোষক!'

আর বিদ্যুতের মনে হয়েছে, প্রবল জ্বরের ঘোরে তার সারা গা কাপছে, পুড়ছে। কিন্তু তার গভীরতর স্তরে রক্ত হিম শীতল, অকম্পিত বরফের মতো জমাট।

তখন হয়তো জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছে, সেদিন কোন্ ছেলের সঙ্গে বিকেলটা কাটিয়েছে মীনাক্ষী। কোনো শাঁসালো ছেলে কি না। কোনো আশা আছে কি না। অর্থাৎ মীনাক্ষীকে সে বিয়ে করবে কি না। কারণ, ওরও একটি আশ্রয় চাই। এবং সেটা স্বামীর আশ্রয়। বিবাহিত জীবনের আশ্রয়। যেমনই হোক, খেতে এবং পরতে পাওয়া, এবং একটি ঘরে বাস করতে পাওয়া। অন্যথায় একটি জীবিকা। যেমনই হোক, শুধু পুরোপুরি দেহবৃত্তি ছাড়া। দেহও থাকবে, যতটা থাকতে পারে, ততটা। আপত্তি নেই।

কিন্তু ছেলে বন্ধুদের কথা কোনোদিনই জিজ্ঞেস করে না বিদ্যুৎ। লাভ কি? দোষ কোথায়? হ্যাঁ, ছাইয়ের তলায় এক আধ ফুলকি আগুন হয় তো আছে বিদ্যুতের বুকে। ঈর্ষার আগুন দেখে দেখে ভেবে ভেবে জেনে জেনেও যে আগুন একবারে নিঃশেষ ছাই হয় না। ঈর্ষার নিয়ম, সে ছাই হতে চায় না। কিন্তু মীনাক্ষীর দোষ কী?

চিনু মণ্ডলের মতো সতেজ স্বাস্থ্যবতী মেয়ের প্রশ্রয়কে হেলা ফেলা করে ফেলে দিতে পারেনি বিদ্যুৎ। ভালো খাইয়েছিল, সিনেমা দেখিয়েছিল চিনু, আর সিনেমার অন্ধকারে, দূর-আলো-আভা ময়দানে, পুরো সুযোগ দিয়েছিল। নৈতিকতা? কোথায়? কোন্

দেশে তার বাস? ফেরায়নি সে চিনুকে। যা দিয়েছে চিনু, গণ্ডূষ ভরে নিয়েছে তার বেশী। খুশী হয়েছে।

মস্ত বড় লোহা ব্যবসায়ীর মেয়ে চিনু মণ্ডল। যার মা নেই, বাপ থাকে রক্ষিতাকে নিয়ে, আর মেয়ে খোঁজে একটি পুরুষ, শক্ত সমর্থ জোয়ান, যাকে খাইয়ে পরিয়ে, রক্ষিত হিসাবে ভোগে লাগানো যায়। কলেজ আর কফি-হাউস ও রেস্তোঁরাগুলি তার ছেলে-ধরার জায়গা। তাই ওকে ছাত্রী সেজে বেড়াতে হয়। ওর পড়া এবং পাশের ব্যবস্থার দাম অন্য লোকের ওপর ন্যস্ত করা আছে। সে জন্যে চিনু মোটা পারিশ্রমিক দিতে পরাঙ্মুখ নয়।

এই চিনুর যখন যাকে ভালো লাগে, তখন তাকে ডাকে। ছেলেরা ওর কাছে অনেকটা দেহোপজীবীর মতো।

বিদ্যুৎ অনেকদিন গিয়েছে। পেট পুরে খেয়েছে হোটেলে, রেস্তোঁরায় আর চিনুর ক্ষুধা মিটিয়েছে। (রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি কি জানেন এ সব? চেনেন এ যুগকে? এটা উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা শহরের স্বৈরাচারী ভদ্রলোকেদের, অন্তঃপুরিকাদের গল্প কথা নয়।) অনিচ্ছায় আর ঘৃণায় চিনুর প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করতে হয়েছে। তবু এই বয়সের রক্তের একটা তেজ আছে। তাই অনিচ্ছা এবং ঘৃণার মধ্যেও রক্ত উল্লসিত হয়।

চিনু যেদিনই চোখের সংকেতে 'তু' বলে ডেকেছে সেদিনই গিয়েছে সে।

এবং তার পরদিনই গিয়েছে মীনাক্ষীর কাছে। দুটি দেহের প্রভেদ সেই মুহূর্তেই প্রকট হয়ে উঠেছে চোখের সামনে। তবু ঠোঁটের ওপরে এসে লাফালাফি করেছে চিনু মণ্ডলের কথা। বুকের মধ্যে একটি বিক্ষোভ, (কী বিচিত্র!) একটি কষ্ট কেমন বিষণ্ণতা এনে দিয়েছে। অস্থিরতা এনে দিয়েছে। কিন্তু বলা হয়নি। বলতে ইচ্ছে করেনি।

আর মীনাক্ষী বলেছে, অস্বাভাবিক হয়ে পড় কেন?

—কেন মীনা?

—কষ্ট হয়তো কিছু আছে, সেটাকে পেয়ে বসতে দিয়ে লাভ কী ?

ঠিকই। এ সব বিষয়গুলি পরস্পরের আলোচনার যোগ্য নয়। লাভ কী ? কারণ সংসারের যে সীমান্তে এসে ওরা দুজনে পড়েছে, সেখানে বুকের জ্বলুনিটুকু হয় তো থাকে, কিন্তু বুকটা এই দেহে। যে দেহ পৃথিবীর মাটিতে হাটে, বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়। ছেলে-বন্ধু আর মেয়ে-বন্ধুর আলোচনায় কী আসে যায়। ঈর্ষায় এবং অবিশ্বাসে, দুঃখে এবং কষ্টে ওরা পরস্পরকে ছাড়বে ?

ছাড়ুক না। সে ছাড়পত্র কে আটকে রেখেছে ? কেউ না। মীনাক্ষী না, বিদ্যুৎ না। আজ যদি মীনাক্ষী রাজপুত্র পায়, বাধা নেই। বিদ্যুৎ যদি পায় রাজত্ব আর রাজকন্যা, কে আটকাতো আসছে ? চলে যাক না ওরা পরস্পরকে ছেড়ে। ঘরে আর শরীরে, কুলায় আর নিষ্ঠায় কে বেঁধে রেখেছে ওদের ? এ ছাড়পত্রের ঊর্ধ্বে কী আর কিছু আছে ? গ্রহের সঙ্গে গ্রহের আকর্ষণের মতো ? যা অদৃশ্য আর বিজ্ঞান যাকে আবিষ্কার করে। আর মনের কাছে চিরকাল অনাবিষ্কৃত থেকে যায় ?

আঃ ! বুকের কাছে কী রকম একটা অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। কষ্টকর, বিশ্রী ! হ্যাঁ, হয়তো এখন মীনাক্ষী কোনো ছেলের সঙ্গে দেওয়ালী দেখতে বেরিয়েছে কলকাতায়। কিংবা রেস্তোঁরার কেবিনে ওর দিকে তাকিয়ে ছেলেটি কাটলেটের শেষ মাংসটুকু চিবুচ্ছে। মীনাক্ষী হাসছে। ঈশান ব্যানার্জী আর মীনাক্ষী হাসছে। সবচেয়ে খারাপ, হাসতে হাসতে হয়তো মীনাক্ষী রাজসিদ্ধি গ্রামকে কল্পনা করতে চাইছে। ঈশান ব্যানার্জী আর মীনাক্ষী ঘোষ ছাড়া আর কেউ জানে না, তার এ অভিযানের কথা।

কিন্তু এবার ! তরঙ্গের দোলাগুলি তো পিছনে পড়ছে তার। এখন সে তীর ছেড়ে দূরে এসেছে। দূরের, গভীরের, স্রোতের ডাক এসেছে তার।

একদিন দুপুরে ডাক এসেছিল সহসা নীচু গোঙানো সুরে ঈশানের গলায়, টেরাকোটা কাকে বলে জানো ?

ঈশান ব্যানার্জী তার স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী, কোনো কর্মচারীর সঙ্গেই অহেতুক কথা বলে না। বিদ্যুৎ রেফারেন্স টুকছিল। মুখ তুলে বলেছিল, জানি।

ঈশান ব্যানার্জীর হাতে একটি বই ছিল। খুলে ধরেছিল সামনে। একটি মন্দিরের ছবি। পুরনো মন্দির। জীর্ণ, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। গা বেয়ে লতা উঠেছে, রাক্ষুসীর মতো জড়ায় নি। সর্বাঙ্গে তার পোড়া ইঁটের কারুকায। নানান পৌরাণিক কাহিনীর নাটকীয় মুহূর্ত ধরা পড়েছে। স্থির অচঞ্চল।

আর একটি ছবি পরের পাতায়। ফ্রেমে বাঁধা ছবির মতো। ফুট ইঞ্চি মেপে তার মাপজোক দেওয়া আছে। পাণ্ডবদের স্বর্গগমনের চারপাশের বৃত্তাকারে, বিচিত্র রেখার গোলকধাঁধা। তার পরের বৃত্তে, সুস্পষ্ট সূক্ষ্ম ছন্দে উৎকীর্ণ কতকগুলি নগ্ন নারী মূর্তি। এক-একজনের এক-এক রকম ভঙ্গি। বিশেষ বিশেষ নারী-অঙ্গকে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার পরের বৃত্তে, পুরুষ ও নারী নানান ভঙ্গিতে দেহলগ্ন। আদিম, নগ্ন সেই সব মূর্তি বিদ্যুতের রক্তে যেন তরল আগুন ছুঁড়ে দিয়েছিল। ছবির মধ্যে সেই সব পুরুষ ও নারীকে সে যেন নড়ে উঠতে দেখেছিল। এবং নিঃশব্দ এক অন্ধকার অরণ্য ভেসে উঠেছিল তার চোখে। কিন্তু তার মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের চাপা শব্দ শুনতে পেয়েছিল সে।

একেবারে মাঝখানে একটি পদ্ম ফুল উৎকীর্ণ ছিল। নীচে লেখা ছিল, 'রুদ্রভৈরবের প্রধান দরজার শীর্ষদেশে, প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্বের এই প্রস্তর শিল্পটি গ্রথিত আছে। পোড়া ইঁটের কারুকার্য খচিত মন্দিরে, এই পাথর কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রোথিত হইয়াছিল জানা যায় নাই।'

লেখাটা পড়ে বিদ্যুৎ চোখ তুলে তাকিয়েছিল। ঈশান ব্যানার্জী নিঃশব্দে আর একটি পাতা উল্টে ধরেছিল। আর একটি ছবি।

ব্যর্থতার ছবি একটি টুকরোয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মৃত্যুরই দৃশ্য আসলে। নীচে লেখা আছে এক খণ্ডে

সর্ববৃহৎ টেরাকোটা শিল্প নিদর্শন। রুদ্রভৈরবের মন্দিরের প্রধান দরজার দক্ষিণ পার্শ্বে গ্রথিত আছে।

ঈশান বলেছিল, এ রুদ্রভৈরবের মন্দির তুমি চেন?

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে বলেছিল, কই, না তো।

মিথ্যে নয়, কোনদিনই দেখেনি বিদ্যুৎ।

ঈশান বলেছিল, সে কী, সেদিন কে যেন কথায় কথায় বলছিল, বাজসিদ্ধি গ্রামে তোমাদের আত্মীয় আছেন। তুমি সেখানে নাকি গেছ বেড়াতে?

বাজসিদ্ধি? সত্যি, স্মৃতির কী বিড়ম্বনা। স্মৃতির দোষ দেওয়া যাবে না। চট করে মনে করতে পারেনি বিদ্যুৎ। জীবনের আবর্তে বাজসিদ্ধি হারিয়ে গিয়েছিল।

ঈশান বলেছিল, হরেন, যে তোমাকে আমার এখানে প্রথম কাজের জন্য নিয়ে এসেছিল, তাকে নাকি তুমি বলেছ, সাঁওতাল পরগণার—

—ও! হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে, বলেছিলুম। ঠিকই বলেছিলুম। আমাদের খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে বাজসিদ্ধিতে। কিন্তু এ মন্দির তো দেখিনি।

ঈশানের গোঙা স্বর বিস্ময়ে ঢেউ দিয়ে উঠেছিল, সে কি হে! বাজসিদ্ধিতে তো মন্দিরই আছে। বিশেষ করে এই রুদ্রভৈরবের মন্দির।

বিদ্যুৎ প্রায় অপরাধীর সুরেই বলেছিল, আমি খেয়াল করিনি।

কিন্তু ঈশান দাঁড়িয়েছিল। ছবিটা দেখছিল যেন খুব মনোযোগ দিয়ে। ঘরে আর কেউ ছিল না। শুধ ঘড়িটা বাজছিল টিকটিক করে। ঈশানের গলা গুঙিয়ে উঠেছিল, কালীপূজোয় খুব উৎসব হয় বাজসিদ্ধিতে।

বিদ্যুৎ বলেছিল, শুনেছি।

—প্রচুর বাইরের লোক আসে তখন।

—হ্যাঁ, তাই শুনেছি।

—গ্রামের আপামর জনসাধারণ প্রায় সেদিন একটু নেশা করে। সাঁওতালরা নাচে, আরও অনেক কিছু করে।

—আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের কাছে কিছু কিছু শুনেছি।

ঈশানের গলায় আক্ষেপ ফুটে উঠেছিল।—এই সব শিল্প পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। নিদর্শনগুলো গ্রামের লোকেরা কেউ রক্ষা করে না। অথচ করা উচিত।

ঈশানের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল বিদ্যুৎ। কী একটা ইঙ্গিত পেয়েছিল যেন সে ঈশান ব্যানার্জীর গলায়। শুধু কথা তো নয়। তবু সে অকারণেই বলেছিল, তা তো ঠিকই।

—বিশেষ করে এরকম একটা অত্যন্ত রেয়ার পাথরের শিল্প আর এই বেযাড়া সাইজের পোড়া ইঁট শিল্প। পোড়া ইঁটের কাজ অনেক আছে, কিন্তু এরকম বড় পীস নাকি আর নেই। এ দুটোকেই অন্তত রক্ষা করা উচিত।

বিদ্যুৎ নীরব ছিল। ঈশানই আবার বলেছিল, কিন্তু উদ্ধার করতে গেলেও গ্রামের লোকেরা লাঠি নিয়ে মারতে আসবে। আশ্চর্য লোক এরা। তুমি গিয়ে নিয়ে এস না।

—আমি?

বিদ্যুৎ অবাক হয়েছিল।—আমাকে দেবে কেন?

—না হয় লুকিয়ে নিয়ে আসবে, কী করা যাবে। যারা এমনিতে ছাড়বে না।

বিদ্যুৎ আবার চুপ করেছিল। ঈশানের গলার স্বর আরো নেমে গিয়েছিল, আরো মোটা শোনাচ্ছিল, আমার এক বন্ধু এ পীস দুটো সংগ্রহ করতে চায়। ক্ষমতাশালী লোক সে। আনতে যদি পার, তোমার যেটা সবচেয়ে দরকার একটা মোটামুটি ভালো চাকরি সে তোমাকে দিয়ে দেবে।

বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল। কোনো কারণে কাঁপতে যে-বুক ভুলেই গিয়েছিল। রক্ত না ঘাম, যা হোক কিছু ফিনকি দিয়ে

ছুটেছিল তার সারা গায়ে। ভয়ে নয়। একটি সামান্য কথায়! চাকরি! চাকরি!

আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আভা ঢুকল খাবার নিয়ে। পিছনে আর একটি ছোট মেয়ে, হাতে জলের গেলাস আর আসন নিয়ে এসেছে। হয়তো রামেশ্বরের মেয়ে।

ফিরে আসে বিদ্যুৎ। ফিরে আসে আতিথেয়তার আসরে, মুখের অমায়িক নম্রতার ভাঁজে, চোখের সরল চাউনির আবরণে। বাজসিদ্ধির রাজ-অতিথি হয়ে ওঠে। তবু ভুল হয়। সে তাড়াতাড়ি চৌকির উপরে বসতে যায়।

আভা বলে, আসন পেতে দিচ্ছে, এখন এখানেই বসুন, খেয়ে নিন।

পিছনের মেয়েটির দিকে ফিরে বলে, দে গীতা, আসনটা পেতে দে ক্যানে তাড়াতাড়ি। জলের ছিটা দিয়া জায়গাটা মুছো দে।

গীতা তার ছোট ছোট হাতে নির্দেশ পালন করল। তার মধ্যে অনেকবার তাকাল বিদ্যুতের দিকে। তা ... বড়দের মতো সলজ্জ হাসল। কিন্তু আভার দু রকম কথা শুনে মনে মনে অবাক না হয়ে পারল না বিদ্যুৎ। এবং বলেই ফেলল, দু রকম কথাই জানা আছে দেখছি।

আভা খাবার থালা নামিয়ে দিয়ে হাসল। বলল, দুমকায় থাকার সময় বলে বলে আপনি হয়ে গেছে। খেতে বসুন।

বসতে বসতে বিদ্যুৎ আবার বলল, আর যারা কলকাতায় অনেকদিন ধরে আছে, তারাও অভ্যাস করতে পারে না।

—চায় না।

আভার গলায় একটু কৌতুক ও বিদ্রূপের আভাস যেন। সাবধান হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ। সচেতন হয়ে ওঠে আভার সম্পর্কে। চোখ নয়, আভার মনও সুদূর অনুভবে সুতীব্র। কী আসে যায় এসবে। আভার পরিচ্ছন্ন কথা বলতে পারা।

কিন্তু আভা তখনো বলছিল, বলতে গেলে, ওদের মনে হয়, সাজিয়ে বলছে। ইচ্ছে করে না বলতে।

বিদ্যুৎ তখন লাল রঙের আটার লুচি ছিঁড়ছিল। তবু লুচি! তরকারি ছিল একটু। আর বাতাসা। যাকে বলে ফেনী বাতাসা। লাল দু-তিন ইঞ্চি ডায়া-মেটার হবে।

বা পকেটটা ফুলে উঠেছে। অ্যাসিডের শিশিটা। তরল আগুন। যদি কোনোরকমে মুখের ঢাকনাটা খুলে যায়, হাত দিয়ে বার করতেও হাত পুড়ে যাবে। জ্বলে যাবে। আর কে জানে, ফুলে ওঠা পকেটের দিকে আভার নজর পড়েছে কি না। অসম্ভব নয়। মীনাক্ষী জাতের মেয়ে আভা। সকলেরই নানান জাত থাকে। ছেলেদের, মেয়েদের, সকলের। যেমন এখানে আভা আর ললিতা। ললিতাকে যেন মনে হয়, খেতে চায় আর শুতে চায়। দশ কথায় মাথা ঘামাতে চায় না। না জেনে ধরা দিতে চায়। আর আভারা বুঝতে চায়, চাপতে চায়, ধরা দিতে চায় না। বোধহয়, বাপ মা নেই, তাই লাঞ্ছনা ওকে তৈরি করেছে।

আভা যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, কী আছে ওটা আপনার পকেটে? একটা কিছু কথা ভেবে রাখা উচিত। জবাব দিতে হবে। তবে আভার জিজ্ঞেস না করাটাই স্বাভাবিক। ওদের কৌতূহল বেশী, চাপাচাপিও বেশী। টর্চলাইটটাও ফুলে উঠেছে। প্যান্ট পরে মাটিতে বসলেই এরকম হবে। আর এখানে টেবিল চেয়ারের প্রত্যাশা করাই বৃথা।

এ সবই ঈশান ব্যানার্জীর ব্যবস্থা। শুধু বাজসিদ্ধির মানুষের চোখকেই ফাঁকি দিলে হবে না। শত্রু আরো আছে। বাজসিদ্ধির শত শত বছরের আবরণে যারা যথ দিয়ে রয়েছে মন্দিরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে, অন্ধকারে, সেই দুধ-গোখরো আর চন্দ্রবোড়ারা ছাড়বে না। ঘুম ভাঙলে সেই প্রহরীরা বিনা যুদ্ধে পালাতে দেবে না। তখন এই তরল আগুন ছিটিয়ে দিতে হবে। গন্ধে আর স্পর্শে শত্রুর পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু তার আগে শত্রুকে দেখতে পাওয়া উচিত। বুকে হাঁটা নিঃশব্দ সেইসব শত্রুরা কখন কোন্‌দিক দিয়ে আক্রমণ করবে, হয়তো তা টের পাওয়া যাবে না। আঘাত যখন করবে—

হঠাৎ সারাটা গা কেঁপে উঠল বিদ্যুতের। সে বাঁ পা-টি চকিতে মেলে দিল। মনে হল কী যেন বেয়ে পড়ছে কুঁচকির কাছে।

আভা জিজ্ঞেস করল, কী হল?

কিন্তু না, বেয়ে পড়ার আগেই জ্বলে উঠবে। সাপের ছোবলটা সে মনে মনে টের পেয়েছে। বিদ্যুতের ওষ্ঠাগ্রে যেন মিথ্যাক সরস্বতী বসে আছে। বলল, হঠাৎ কেমন ঝিঁঝি ধরেছে পায়ে।

আভা তাকিয়ে আছে পায়ের দিকে। ঝিঁঝি লাগা কি চোখে টের পাওয়া যায়? যেন চিন্তিত হয়ে উঠেছে অথচ ঠোঁটে একটু হাসির আভাস। তার মানে কি, অবিশ্বাস করছে বিদ্যুৎকে। আবার বলছে, অনেকটা হেঁটে এসেছেন, তাই। আর লুচি দেব?

—না।

বিদ্যুৎ গুনে দেখেনি। কিন্তু বাজসিদ্ধির হিসেব অনুযায়ী জলখাবারের যে গোছাখানেক লুচি ছিল, প্রায় শেষ করে এনেছে। দুর্ভাবনায় লোকে খেতে পারে না। তার উল্টো প্রমাণও পাওয়া যায়। কোনটা যে মানুষের সত্যি, মানুষ তার কিছুই জানে না।

এমন সময়ে দরজায় শোনা গেল, আঃ, আস ক্যানে? আমার দাদা হয়, আস।

ললিতা। এলো আঁচল, বিস্রস্ত জামা। কাকে ধরে যেন টানছে এবং ধমকাচ্ছে! বিদ্যুৎ দেখল, আভা প্রায় লুটিয়ে পড়ছে শব্দহীন হাসিতে। লজ্জায় মাথা নত। কিন্তু বিদ্যুতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আবার দরজার দিকে তাকাল বিদ্যুৎ।

ললিতা যেন কাকে ধরে টেনে ঘরে ঢোকাল। বলল, বাবা গ লজ্জা দেখ্যা বাঁচি নাই। কলকাতা থিক্যা আসছে দাদা, পেন্নাম কর! যাও।

বিদ্যুৎকে বলল, দেখছ ত বিদ্যুৎদা, তুমাদের জামাইটো শরমে মর‍্যা যেইছে!

এর আগে ললিতা তাকে তুমি বলেছিল কি না মনে পড়ল না

বিদ্যুতের। কিন্তু সে একটি বিশ বাইশ বছরের ধুতি পাঞ্জাবি পরা ছেলেকে দেখতে পেল। মাথায় একরাশ চুল, স্বাস্থ্যবান, লম্বা, পুরোপুরি গ্রাম্য ভাল মানুষের মতো দেখতে। কাছে এসে বিদ্যুতের মেলে দেওয়া পা-টি স্পর্শ করে অন্য পা-টি খুঁজতে লাগল। প্রণাম করতে চায়। বিদ্যুৎ প্রায় খাওয়া ফেলে উঠে পড়ে আর কি। সে বলল, থাক থাক।

তবু সে ডান পা-টি স্পর্শ করে কপালে ছুঁইয়ে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুৎ তাকাল আভার দিকে। আভা বলল, ললিতার বর।

—ও, তাই নাকি?

বিদ্যুৎ যেন অবিশ্বাস্য নাটকীয় ঘটনা দেখছে। বিস্ময়ে সে হাসতেই পারল না।

ললিতা বলল, দ্যাখ ক্যানে বিদ্যুৎদা, ই লোকটা সব ঢঙ করছে। তুমাদিগের শহুরে-বিত্তি খুব জানে। আর এখন লজ্জায় মর‍্যা যেইছে। সব জারিজুরি আমার কাছে। সঙ্গ ছাড়ে না আমার, হি হি হি।

হেসে উঠল ললিতা। আবার বলল, পায়রার স্বভাব, জানলে বিদ্যুৎদা, খালি ঘুর-ঘুর-ঘুর-ঘুর।

বিদ্যুৎ কি বলবে ভেবে পেল না। ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ললিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। স্খলিত আঁচল, আর বিস্রস্ত জামায়, ওর দেহের বন্যতা অন্ধ কামনায় যেন ফেটে পড়েছে। আকণ্ঠ পিপাসার নেশায় চোখ দপ্ দপ্ করছে। মেয়েটা এখন একেবারে যেন কাণ্ডজ্ঞানহারা উন্মত্ত। স্বামীর উদ্দেশ্যেই বলে উঠল, আই দ্যাখ ক্যানে, এই কুথা যেইছে? খালি আমার পিছুতে লাগ, ইবারে কী হয়?

বলে হাসতে হাসতে ললিতাও বেরিয়ে গেল।

বিদ্যুতের সঙ্গে চোখাচোখি হল আভার। আভার মুখে সলজ্জ

হাসিটি লেগেই ছিল। বড়দের মতো স্নেহ মিশিয়ে বলল, পাগল। বোধহয় সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু খেয়ে মরেছে।

বিদ্যুৎ যেন এক মুহূর্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

মেজবউ ঢুকলেন। হাতে চায়ের কাপ। বললেন, দেখলে বাবা, জামাই দেখলে? ছেল্যামানুষ, ত্ববরাজপুরে বাড়ি। অবস্থা ভাল, জমিজমা আছে মেলা।

বিদ্যুতের হিংসে হল ছেলেটাকে। বেশ আছে ললিতার বরটা। পৃথিবীর কিছুই জানবার দরকার নেই। একটি নিটোল অরণ্যের স্বাধীন পশুর সৌভাগ্য ছেলেটার। সে বলল, বেশ ভাল।

মেজবউ বললেন, তুমাদিগের আশীর্বাদ বাবা। আভি, এঁটো থালটো তুলে লিয়ে যা মা।

বিদ্যুৎ তখন থালার ওপর হাত ধুয়ে চায়ের কাপ তুলে নিয়েছে।

আভা থালা নিয়ে চলে গেল। ছোট মেয়ে গীতা কখন পালিয়েছে, খেয়াল নেই। মেজবউ কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করলেন। ডাক এল। বোধহয় স্বর্ণই ডাকছেন।

—দেখছ ত বাবা, সারা রাতটো এই ভাবাতে কাটবেক। থাও তুমি, আঁ?

বলতে বলতেই বেরিয়ে গেলেন। নিঃশ্বাস পড়ল একটি বিদ্যুতের। অস্থিরতা বাড়ছে তার। এই ঘরে আর বন্দী হয়ে থাকতে পারছে না। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল। বাঁ পকেটে হাত ঢোকাল। আভা এসে দাঁড়াল দরজায়। বলল, আপনি এখন বিশ্রাম করবেন তো?

বিশ্রাম? এখানে বিশ্রাম করতে এসেছে নাকি বিদ্যুৎ। বলল, না, ঠাকুরের ওখানে যাব।

আভা হাত বাড়িয়ে বলল, পান খান তো?

হাতে ছ'খিলি পান। বোঁটায় চুন। সবই খায় বিদ্যুৎ। সবই করে। কিন্তু কী চায় আভা। ওর চোখের ওপারে অস্পষ্ট ওটা কী? লুকিয়ে থেকে লক্ষ্যভেদের মতো? উদ্দেশ্য জানতে চায়?

নাকি ভালো লেগে গেল বিদ্যুৎকে। কোনটা? ঠোঁট আর চোখের চারপাশের রেখাগুলি তীক্ষ্ণ এবং কঠিন হয়ে উঠতে চাইল। পান নিল সে। চিবুবার ভান করে, মুখের ভাব অটুট রাখল। আভা দেখছে এখনো। যেন বিদ্যুৎ টের পাচ্ছে না। কিন্তু সারা গায়ে যে ফুটছে বিদ্যুতের। কিছু বলতে চায় নাকি।

তাই বলল আভা, মাসীমারা সবাই ব্যস্ত। আপনার যত্ন হচ্ছে না।

যত্ন করতে চায় নাকি আভা। সে বলল, তা কেন?

আভা বলল, তাই বলছি। কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন। আর · ।

বিদ্যুৎ তাকাল। আভা বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, শরীর ভাল নেই। খুব কষ্ট হয়েছে আসতে। পুজো অনেক রাত্রে। একটু পরে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

কর্তব্য এবং মর্যাদা ছাড়াও আরো কিছু আছে আভার সুরে। ভালো লেগে গেল নাকি বিদ্যুৎকে? কিন্তু চিনু মণ্ডলদের মতো মেয়ে তো নয় আভা। পোড়-খাওয়া হওয়াই তো স্বাভাবিক। বিদ্যুৎকে দেখে চিনতে পারছে না? নীতিকে যে খেয়ে বসে আছে। মেয়েদের প্রীতির কোনো নৈতিক মূল্যেই যে বিশ্বাস করে না। তৃষ্ণার্ত বালিয়াড়ির মতো, যা পাবে, তাঁর বেশী শুষে নিতে চাইবে। না কি এটা মীনাক্ষীদের জাতের ব্যাপার! নিরুপায় অসহায় ভালো লাগা।

বিদ্যুৎ বলল, ঘুম পাচ্ছে না, আমার বাইরে যেতেই ইচ্ছে করছে।

বাঁ পকেটের ভিতরে শিশিটার মুখটা অনুভব করতে করতে বলল সে। আভা চুপ করে রইল। যা তার মন সায় দেয় না, তাতে সে চুপ করে থাকতে বোধহয় অভ্যস্ত। কিন্তু চোখের ওপারে ওটা কি? এই দূরগামিনী চোখ দুটিকে কোনোরকমেই বিশ্বাস করবে না বিদ্যুৎ। সে বাইরের দিকে পা বাড়াল। বাতি নিয়ে অনুসরণ করল আভা। দুই ঘরের মাঝখানে, অন্ধকার গলির মোড় পর্যন্ত এল। ইতিমধ্যে ঠাকুর দালানের উঠোনে দুটি হ্যারিকেন এসেছে। কালীর জিভের মতো লাল শিস বাতাসে কাঁপছে।

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে, পিছনে আভা দাঁড়িয়ে আছে বাতি নিয়ে। বিদ্যুৎ ঠাকুর-দালানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পায়ে পায়ে। কিছু বলা উচিত নাকি তার? তার মন বলছে আভা পিছন থেকে তাকিয়ে আছে এবং হয়তো অপেক্ষা করছে, বিদ্যুৎ তাকে চলে যেতে বলবে। এবং পিছন ফিরে তাই বলল সে, ঠিক আছে, আর দরকার নেই।

আভা তাকিয়েই ছিল। বলল, আচ্ছা।

কিন্তু চোখ তুলে যেন কাউকে খুঁজল। তারপর ডাকল, লকা? লকা আছিস নাকি ইখানে?

—ক্যানে?

অসুরটা ঠাকুরদালানের কোল আধার থেকে উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, অন্দরের কাজকামে লকাকে পাবেক নাই গ'।

আভা বলল, তা' জানি। পাঁচু কুথা গেলছে?

—জানি না। উয়ার কথা আমি জানি না। দেখগা কুথা তাড়ি পচুই খেয়্যা বস্যা রইচে কি না।

কার যেন কেসো মোটা গলা শোনা গেল, তুমার মতন?

বলে খ্যাল খ্যাল করে হাসল লোকটা। বোধহয় ঢাকীদের মধ্যে কেউ।

বিদ্যুৎ দেখল, আভা বাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে।

লকা গলার স্বর লক্ষ্য করে ফিরে দাঁড়াল।—কে? কে হ্যা? আমি কি বস্যা রইচি? ইটো বাঁধলে কে? বেড়াটো? আস, মুখের ঘাস লেবে, আস ক্যানে?

কেউ সাড়া দিল না। কালো কালো মানুষগুলির কাউকে আলাদা করা যায় না। ঢাকীরা একদিকে আর একদিকে সাঁওতাল এবং বলির পশুরা দলা দলা জমে আছে। সিঁড়ির কাছ হ্যারিকেনের লালাভ আলোয় শুধু কোনো কোনো চোখ চকচক করছে। ভয়ে নয়। বোধ-হয় লকাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ফুর্তি করতে চায় সবাই।

কিন্তু আভা পায়ে পায়ে ঠাকুরদালানের দিকে এল। বিদ্যুতের

কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল, কালী প্রতিমার মুখোমুখি। তার দু-হাতে ধরা হ্যারিকেনটা ঝুলছে হাঁটুর কাছে। ধোঁয়ার রেশ আভার সবুজ কাপড় বেয়ে উঠছে। আগুন লেগে যেতে পারে। এভাবে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বিদ্যুৎ কালী প্রতিমার দিকে চোখ ফেরাল। লকা এগিয়ে গেল ঢাকীদের দিকে।

কিন্তু দাঁড়াল না। চলে গেল ঠাকুরদালানের পিছনে। মানুষের ঘন-চলতি রাস্তার চিহ্ন একটা রয়েছে পিছনে যাবার। আর ওদিকেই একটি মন্দির আছে। দেখেছে বিদ্যুৎ।

কয়েকজন হেসে উঠল চাপা গলায়। হাসিটা লকার উদ্দেশেই বোধহয়।

বৃষ্টির বিন্দু বিন্দু ফোঁটা আর পড়ছে না। কিন্তু আকাশটা আরো অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। বাতাসের বেগ একই রকম। ঠাকুরদালানে হ্যারিকেনের আলোতেও কালী প্রতিমা তেমনি মিশে আছে আলো আঁধারে। বাতাসের ঘায়ে হ্যারিকেনের শিখা কাঁপছে, তাই বোধহয় কালীর করাল রক্তাভ জিভের ডগাটিও কাঁপছে। আর কান পর্যন্ত টানা চোখের তারা দুটি কি সত্যি নড়ছে নাকি? নিশ্চয় কোনো ছোটখাটো জিনিসের ছায়া কাঁপছে। কিংবা কালীর মাথায় পরানো চূড়ায় রাংতার ঝলক লেগেছে চোখে। যদি জিভটা বাইরে না থাকত, তাহলে হয়তো এ মুখ চেনা চেনা লাগত। যেমন গলার মুণ্ডুগুলি দেখে চেনা চেনা লাগে। গলাকাটা নিহত মুখগুলির ভাব বড় আশ্চর্য! আর সত্যি কি এমন কেউ ছিল! এমন নারী, করাল মুখ, খড়্গধারিণী, মুণ্ডমালিনী, দিগম্বরী? যদি সত্যি হত, তাহলে সে পরিবেশটা···।

আভা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেন যে বিদ্যুৎ চোখ ফেরাল, বুঝতে পারল না। সহসা তার মনে হল, চোখ দুটি প্রায় প্রতিমার মতোই। খারাপ, ভীষণ খারাপ লাগল বিদ্যুতের। কী চায় মেয়েটা! কালী যদি সত্যি হয়, তাহলে বিদ্যুৎ যখন তার কার্যসিদ্ধি করবে, তখন দেখতে পাবে নিশ্চয়? সে প্রতিমার দিকে ফিরে তাকাল। ঠিক

বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। অবিশ্বাস্য। ও তো মাটির চোখ। বাঁ হাতে অ্যাসিডের শিশিটা ঠেকছে। চাউনি খর না হলে, আগুনের মতো দীপ্ত না হলে, মীনাক্ষীদের চোখ প্রায় ওই রকমই। মীনাক্ষীদের মানে তার পাশে আভারও। এব এসব চোখ খুব দূরগামিনী। ঘরের ভিতর অদৃশ্য থেকেও অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। কিন্তু রেহাই দেবে না বিদ্যুৎ। যে চোখই এসে তখন তার সামনে দাঁড়াবে। দেব, দানো, যক্ষরক্ষ মানুষ, কাউকে ছেড়ে দেবে না বিদ্যুৎ। পুড়িয়ে গলিয়ে শেষ করে দেবে।

এই সময় জোরে বাতাস এল। অন্ধকারে কোন্ গাছে দুটি শুকনো তাল পাতা ঝাপিয়ে পড়ল যেন পরস্পরের ওপর। ঝাপটা-ঝাপটির শব্দ বাজতে লাগল অন্ধকার শূন্যে।

কে যেন পিছন থেকে চীৎকার করে উঠল, হেই ফটকে, ফটকে!

ঢাকীদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে তেমনি চীৎকার করে জবাব দিল, হ কত্তা।

তেমনি চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, আমি ঘটটো লিয়ে আইচি র‍্যা। আসনটো লিয়ে আইচি, ইবার বসাবেক।

একটা তাড়াহুড়ো পড়ে গেল ঢাকীদের মধ্যে। ঢাকের পালকগুলি থর থর করে কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ গলা শব্দে বেজে উঠল ঢাক। কষে টানা আর আগুনে সেঁকা চামড়া, তীক্ষ্ণ গলা পাগলীর অট্টহাসির মতো হিহি করে উঠল।

বিদ্যুৎ সরে দাঁড়াল। তার পাশ দিয়ে একজন সিঁড়ি দিয়ে দালানে উঠে গেল। হাতে ঘট, আর ঘটের ওপরেই পিতলের গোল পাত্র। পিতলের পাত্রের বুকটা যেন রক্ত লেপা। কী সব আঁকাজোকা।

একটা ঢাকই বিরতিহীন এক দমকে বাজতে লাগল। তার মধ্যেই কতকগুলি গলার স্বর অস্পষ্ট শোনা গেল। কিন্তু ছাগলের ভীরু চীৎকার চাপা পড়ল না।

ঘটবাহী লোকটিকে চেনা চেনা লাগল। বিদ্যুৎ ফিরে তাকাল

আভার দিকে। আভা যেন হাসছে। তার দিকে তাকিয়ে নেই। কিন্তু যেন তার দিকেই চোখ রয়েছে। এবং তার ঠোঁট নড়ে উঠল। বিদ্যুৎ স্পষ্ট শুনতে পেল, 'আসন।'

বিদ্যুৎ আবার জিজ্ঞেস করল, কিসের আসন?

—শুনেছি, অষ্টদল আসন বলে। পিতলের পাত্রে চন্দন দিয়ে আঁকতে হয়।

—সেটা কী?

—আমি জানি না।

চুপ করে আবার বলল, ওসব নাকি কারুর জানতে নেই। বিদ্যুতের যেন মনে হল, রুদ্রভৈরবের মন্দিরের সেই পাথরের ছবির চার কোণে চারটি আসন আঁকা দেখেছিল।

আভা চোখ তুলল। বিদ্যুৎ দেখল, আসনের চিন্তা নেই ওর চোখে। আভার গলা আবার শুনল, আপনি তাহলে এখানে থাকবেন এখন? কলকাতা থেকে তো সেই ভোরবেলা বেরিয়েছেন।

এ কথার মানে কী? পারম্পর্যহীন কথা। সে বলল, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

—আমি তাহলে যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

কে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল আভাকে। অনেক আগেই সে যেতে পারত। বিদ্যুৎ ফিরে যাবে আশা করে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল। আশ্চর্য! হয় বোকা, নয় ন্যাকা, কিংবা মনটা সেকালের মতো। যেকালে মানুষ মানুষের জন্যে দুঃখ পেত। মানুষ মানুষের সুখ দুঃখের কথা ভাবত।

আভা চলে গেল ধীরে ধীরে। ঘট বসানো হল। বসিয়ে নেমে আসতে লাগল ঘটবাহী। ঢাকের শব্দটা স্তব্ধ হল। কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে উঠল বিদ্যুতের। কোনো শব্দ পাচ্ছে না সে। পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই। বাতাসেরও না।

ঘটবাহী সামনে এসে দাঁড়াল বিদ্যুতের। বলল, তুমি আসছ,

শুনেছি বাবা। কাদরে নাইতে গেল্‌ছিলুম। বেশ বাবা বেশ ভারি খুশী হইচি।

মেজকত্তা রামেশ্বর। প্রায় গগনেশ্বরের মতোই দেখতে। পোশাকেও সেই রকম। একটি ধুতি সারা অঙ্গে। তবে ডোমন চক্রবর্তীর থেকে একটু ক্ষীণ, একটু স্থির।

আবার পায়ে হাত দিতে হবে। ঝুঁকতে গেল বিদ্যুৎ। না-না করে উঠলেন রামেশ্বর। বললেন, থাক বাবা, উতেই হবে! জয়স্তু! জয়স্তু! চানটান কর‍্যা আইচি। জলটল দেওয়া হয়েছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

চলে গেলেন বাড়ির ভিতর দিকে। এখনো বিদ্যুতের কান দুটি শব্দহীন। একটি মহাশূন্যতা যেন পাক খাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে যেন কী ঘটে গেল। সে সব জানে না। এখন মনে হচ্ছে, আভার চোখ দুটি তার সামনে। শক্ত হাতে শিশিটা চেপে ধরল সে পকেটের মধ্যে। শহরের শানে ঘা খাওয়া মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। যে কোনো চোখ তার সামনে পড়বে, কারুর রেহাই নেই। যাই ঘটুক, কোনো ঘটনাই ঘটনা নয়।

ঠাকুরদালানের পিছনে এসে দাঁড়াল বিদ্যুৎ। একটি ঘর চোখে পড়ল। মাটির দেয়াল, পাতার ছাউনি, কিন্তু বড় ঘর। দরজাটা আধভেজানো, আলো আছে ভিতরে। পাতার ছাউনিতে বাতাস লাগছে। আর সব অন্ধকার।

একটু দূর থেকে কথা ভেসে আসছে অন্য কোনো বাড়ি থেকে। যেন মাটির তলায় কারা কথা বলছে, এরকম শব্দ শোনা যায়। তারপরে একটি স্পষ্ট গলায় শব্দ শুনতে পেল। মেয়েমানুষের গলা।
—ক্যানে, রাজসিধিতে তু ছাড়া কুন মাগী পূজা দেখতে যাবেক নাই? ন্যাকা বুঝাতে আসছ ক্যানে?

তারপরে পুরুষ গলার একটি ধমক। আবার বাতাসের শব্দ। পাড়া আছে ওদিকটায়। ঘরবাড়ি আছে। কিন্তু মন্দিরটা

কোথায় দেখা গিয়েছিল। বিদ্যুৎ পা বাড়াতে গেল। ডাক শুনল, কে ?

বিদ্যুৎ ফিরল। আধ ভেজানো দরজা। ঘরের সামনে লোক। এবার উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা শোনা গেল, কে উখ্যানে ? এই লকা, বাতি লিয়ে আয় ক্যানে, দ্যাখ্ কে এল।

ডোমন কথা বলছেন। কার অপেক্ষা করছেন উনি ? এত ভয় কিসের ? সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমি, বিদ্যুৎ।

—অ !

দাওয়ার সামনে এগিয়ে এলেন ডোমন চক্রবর্তী।—আস ক্যানে বাবা, আস। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস।

লকা ঘরের ভিতর থেকে ডেকে উঠল, অই গ' বড় কত্তা, শুনেন গ।

কোনো জবাব দিলেন না ডোমন। বিদ্যুৎ উঠে এল দাওয়ায়। তীব্র গন্ধ তার নাকে ঢুকল। তাজা গন্ধ। গরম হাত দিয়ে বিদ্যুতের শক্ত হাতটি ধরলেন ডোমন। ডোমনের হাতও বেশ শক্ত। প্রায় টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে।—আস, আস বাবা, বস।

একটি নড়বড়ে টেবিল, গুটি তিনেক পুরনো চেয়ার আর খান দুয়েক টুল। মাটির দেয়াল শূন্য। পাশে আর একটি ঘর আছে। দরজা নেই। মাটির দেয়াল দিয়ে আড়াল করা একটি অন্ধকার অংশ। সরু একটি প্রবেশ পথ। বোধহয় কোনো আসবাব নেই ঘরটির মধ্যে।

বিদ্যুৎকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন ডোমন—বস বাবা, বস।

কী বলতে চান ডোমন ? বিদ্যুৎ বসল। কিন্তু লকা কোথায় ? তার গলার স্বর তো এঘর থেকেই শোনা যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে মদের গন্ধটা উগ্র।

লকা দেখা দিল পাশের ঘরে ঢোকবার মুখে। গলার স্বর নীচু করে ডাকল সে, অই গ বড় কত্তা, ইদিকে আসেন ক্যানে একবারটি।

ডোমন বলে উঠলেন, কী, অাঁ, কী শুনতে লাগবে ?

ধমক মানল না লকা। বলল, আঃ! আপনকার ই কি দশা দেখি গ' আমি। আপুনি ঘরবার আলামাটি করলেক গ ?

ডোমন হেসে উঠলেন, অঁ। তু জানছিস, অঁ! আরে গাধা, তু বার দেখলি কুথা ? ই ছেল্যাটো আমাদিগের ঘরের ছেল্যা লয় কি রে ? অাঁ ? অ্যাই, এ দাদাবাবুটোকে তু গড় করছিস কি ?

লকা এগিয়ে এল। এক মুখ হাসি লকার মুখে। চোখ দুটি অনেকটা ডোমনের মতো। হাসতে গিয়ে চোখ হারিয়ে যায়। শুধু কতগুলি রেখা চোখের চারপাশে। নাকটা একটু বোঁচা, থ্যাবড়া। পায়ে হাত দিল বিদ্যুতের! বিদ্যুৎ বলে উঠল, থাক থাক।

—থাকবেক ক্যানে গ' দাদাবাবু। বামুনের পায়ের ধুলো কি থাকে ? উ ত সবাই লিয়ে লেয়।

বিদ্রূপ না ভক্তি, বুঝতে পারল না বিদ্যুৎ।

ডোমনের মুখ আরো লাল হয়েছে। একে পান মেশানো, তায় পুরনো সোনার মতো। কিন্তু সোনাখরকে রেখাগুলি যেন অদৃশ্য হচ্ছে। মুখ যেন ফুলছে, কাঁপছে। হেসে বললেন, যা যা, তু বসগা যা দেকিন।

লকা গেল না। বলল, ই সাঁজরাতে আপনার কী হল গ ? বড়কত্তা! পুরা রাতটো রইচে, আপনার মতিগতিটো ভাল লাগছে না আমার।

—এই লকা, তু চুপ যা।

—হুঁ, আজা কথা বলে। পেজাটো খালি শুনবেক, ক্যানে ?

ডোমন হাসলেন বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে। দু হাঁটু নাড়তে লাগলেন ঘন ঘন! বললেন, বল বাবা বল, কলকাতার খবর বল। উ পাগলটোর কথা কানে লিও না।

লকা বলল, হুঁ, সাচা কথা বুইললে পাগল হয় গ বড়কত্তা।

যেন প্রভুভৃত্যের কথা নয়, সম্পর্কও নয়। কিন্তু প্রভুভৃত্যই। তবে দুজনেরই অবস্থা বোধহয় এক। ডোমন কী যেন বলতে

যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে দাওয়ার ওপরে যেন মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল।

—কে, কে হ্যা !

ডোমন চমকে উঠলেন। মুখটা কুঁচকে ড্যালাডুমরি পাকিয়ে গেল। লকা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। লকা বেরুবার আগেই দরজায় একটি মূর্তি ভেসে উঠল। ঘরের হ্যারিকেনের আলো পড়ল তার গায়ে। বিদ্যুৎ দেখল, একটি মেয়েমানুষ। মেয়ে বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে বড়। আভাদের চেয়ে বড়। কিন্তু বন্য স্বাস্থ্য মেয়েটির। ঔদ্ধত্যের কোথাও লুকোচুরি নেই। জামা নেই, খাটো আধময়লা শাড়ি পরনে। এরকম দেখা অভ্যাস নেই। তাই এসব দেহের উচ্ছলতা, হয়তো নির্দোষ এবং সরল আর অনায়াসপ্রমত্তা, তবু নির্লজ্জ মনে হয়। সন্ধ্যায় নদী ডিঙোবার সময় সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে। তারই মতো। কিন্তু বয়স রা কাড়েনি কোথাও মেয়েটির শরীরে। তাই বয়স বোঝা যায় না। ছোট একটি ঘোমটা আছে মাথায়। চোখের দৃষ্টিতে যুগপৎ সন্দেহ ও রঙ্গ আছে তার। সীমন্তে সিঁদুর, কপালে পিতলের টিপ।

ডোমনের মুখের গন্ধের সঙ্গে, এ ঘরের উগ্র গন্ধটার সঙ্গে মেয়েটির একটি মিল আছে। গন্ধ আর মেয়েটা, বাইরের বাতাস, মেঘ, অন্ধকার আর ঘরের এই আলো সব যেন এক। একটিই কথা বলছে যেন। আর সেই কথাটি বিদ্যুতের বুকের অন্ধকারে, একটি কুণ্ডলী পাকানো সাপের মতো নিষ্কুণ্ডল হতে লাগল। লোকেরা একে পাপ বলে। বিদ্যুৎও তাই বলবে। যদিও সে জানে, পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই সংসারে। অভ্যাস এবং সংস্কার বদলায়।

লকা বলে উঠল, সোনা নাকি ?

মেয়েমানুষটি ঘোমটা আর একটু টানল। বিদ্যুৎকে দেখল একবার। তারপর ডোমনের দিকে। কেমন একটু খটকা লাগল বিদ্যুতের মেয়েলোকটি মুখ নামিয়ে জবাব দিল, হুঁ।

ডোমন উঠে পড়েছেন চেয়ার ছেড়ে। সরে গেছেন পাশের

ঘরটার কাছে। আর উৎকণ্ঠিত নন তিনি। কিন্তু একটা অসহায় উত্তেজনা তাঁর মুখে। তিনি লকার মুখের দিকে তাকালেন। লকা তাকাল তাঁর মুখের দিকে। তারপরে বিদ্যুতের মুখের দিকে। বিদ্যুৎ চোখ সরিয়ে নিল। মনে মনে বলল, হুঁ।

কিন্তু 'হুঁ' শব্দটা আটকে গেল বুকের মধ্যে। সোনার মাথা নত। আর ডোমন চক্রবর্তীর মুখটিকে বিদ্যুৎ এ ঘরে মেলাতে পারছে না যেন। কোথায় একটি ফারাক থেকে যাচ্ছে।

—সোনাকে অখুন যেতে বল লকা।

ডোমন চক্রবর্তীর গলার স্বর যেন মাটির তলা থেকে শোনা গেল। লকা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তু অখুন যা সোনা।

সোনা মুখ তুলল। বিদ্যুৎ দেখল, যত কম বয়স ভেবেছিল, তার চেয়ে সোনা বেশী বয়স্কা। ওর মুখে বয়স আর চুপ করে থাকতে পারেনি। অস্পষ্ট অল্প রেখায় কথা বলে উঠেছে। আর ওর চোখেও সেই ছায়া। যেটাকে রঙ্গ ভেবেছিল বিদ্যুৎ, সে শুধু আলো আঁধারের তরঙ্গ। গাঢ় ছায়া, বিষণ্ণতায় সোনার চোখের আয়তন যেন বড় হয়ে উঠেছে। আর সেই চোখের তলায় একটি আবর্ত অনুমিত, কিন্তু দেহের উচ্ছলতায় ফেটে পড়তে পারছে না। তার চোখ ডোমন চক্রবর্তীর দিকে। সে বলল, কখন আসব?

তেমনি গলায় ডোমন বলে উঠলেন, বুইলতে লারছি।

লকা বলল, বড়কত্তা, বুইলতে লারছেন।

সোনা এবার চোখ নামাল না। বলল, রাতভর ঘুমাতে লারব। বিষ্টি যদি লামায় ত, কী হবেক?

ডোমনের গলা আরো বসে গেল, উপায় নাই।

লকা বলল, উপায় নাই সোনা।

ডোমন চক্রবর্তীর গলা যেন অনুনয়ে কেঁপে গেল, দিক করিস্ নাই ইবারটো সোনা, আসিস।

লকা তাকিয়ে রইল ডোমনের মুখের দিকে। সোনা মাথা নীচু করে যেতে গিয়ে আবার ডোমনের মুখের দিকে তাকাল।

তার ঠোঁট দুটি একবার নড়ে উঠল। কিছু বলল না। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইল। একটা নিঃশ্বাস পড়ল। মুখটি করুণ দেখাল। তারপরে চলে গেল।

বিদ্যুতের মনে হল, তার নিজের অস্তিত্বই যেন নিজের কাছে অনুপস্থিত। সে কে, এরা কারা, সব তার ধারণার বাইরে। সব এক দূর শূন্যের তরঙ্গে যেন ভাসতে লাগল। বিদ্যুৎ যেন কেউ নয়। ব্যাপারটির মধ্যে যেন কোনো পাপ নেই। একটি ঘটনা মাত্র। হয়তো একটি বিশেষ ঘটনা। আর ডোমন চক্রবর্তী এইসব স্পষ্ট অস্পষ্ট তমসার সঙ্গে তমসার দোলা খেলার ঊর্ধ্বে। শুধু এক অজানা অবস্থান থেকে, কী এক প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত, বিচলিত।

—অই গ বড়কত্তা।

মোটা শান্ত গলা শোনা গেল লকার।

বিদ্যুৎ দেখল ডোমন চুপচাপ তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাস শান্ত মনে হচ্ছিল বাইরে। কিন্তু সহসা মেঘ ডেকে উঠল দূরে।

লকা গলা তুলে ডাকল, বড়কত্তা।

ডোমনের গলায় স্বর আরো নেমেছে। বললেন, বল ক্যানে?

লকা চীৎকার করে বলল, আমার মনটা ভাল গাইছে না। আজ রাতটোকে লকা-বাউরির ভয় লাগছে গ। বড়কত্তা, আপুনি ঘরকে যান।

ডোমন বললেন, চুপ যা।

—না, চুপ যাব ক্যানে বড়কত্তা। আপুনি ঘরকে যান, পূজাপাট দ্যাখেন গা।

ডোমনের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হঠাৎ বিদ্যুতের দিকে ফিরলেন। হাসলেন। কিন্তু রেখাগুলি সরলো না মুখের। তাড়াতাড়ি কাছে এলেন। তেমনি অতিথি-বৎসল স্নেহের সুরে বললেন, ই দ্যাখ ক্যানে বাবা, তুমি বসে আছ, মনে নাই।

লজ্জিত নন, কুণ্ঠিত নন। কেন? যেমনই হোক, এ ঘটনা বিদ্যুতের সামনে ঘটল বলে, বিব্রত হলেন না ডোমন? সমস্ত

উত্তেজনাটা যেন লকার পেশীতে গিয়ে ফুলছে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে বলল, আমি ঘরকে যাব বড়কত্তা। আমি যাব গা।

ডোমন বললেন, মাথা খারাপ করিস নাই রে গাধা। যা, রাস্তায় যেহয়ে দাঁড়া। মাত্তুচুয়ার সাহেবটো আসবে। আমাদিগের রবিশন সাহেব, তাকে ই ঘরকে লিয়ে আসবি, যা।

ডোমনের সঙ্গে লকার উত্তেজনা ঈষৎ প্রশমিত।—ক্যানে, রবিশন আজা র বাড়িটো চিনতে লারবেক ?

—অতিথ লয় রে গাধা ?

—অতিথ ! বড়কত্তা, আজা গ' তুমরা।

—হ রাজা। তু যা ক্যানে ?

আবার মেঘের গর্জন শোনা গেল। বিদ্যুৎ বাইরের দিকে তাকাল। সেখানে সোনা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে মীনাক্ষীকে দেখতে পেল সে। মীনাক্ষীর চোখ কি সোনার মতো ? সোনা, মীনাক্ষী, আর মাত্র কিছুক্ষণ আগে দেখা আভা। সকলে কি এক ? কারণ, বিদ্যুতের মনে হচ্ছে, ডোমন চক্রবর্তী আর সোনা, মুখের কথার চেয়ে, নিঃশব্দে কথা বলেছে অনেক বেশী। পরস্পরের চোখের দিকে না তাকিয়ে। তারা পরস্পরকে যেন দেখতে পাচ্ছিল। কেন এরকম মনে হল বিদ্যুতের। সোনার চোখের গাঢ় ছায়া, গভীরের আবর্ত আর বারে বারে ফিরে তাকানো, সবটার মধ্যে মীনাক্ষী ফুটে উঠল।

মীনাক্ষীর সেই মুখ তার মনে পড়ছে। বাজসিদ্ধিতে আসবার আগে সে যখন বলেছিল, মীনা, এবার ?

—কী এবার ?

—আমি যখন ফিরে আসব বাজসিদ্ধি থেকে ?

—তুমি যখন ফিরে আসবে সাকসেসফুল হয়ে ?

—হ্যাঁ, আমি যখন সার্থক হয়ে ফিরে আসব, আর—

—আর তুমি যখন—

—হ্যাঁ, আমি যখন বেলা দশটায় বাসে ট্রামে বাদুড়ঝোলা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে যাব, আর পাঁচটায় ফিরব ?

মীনাক্ষী চুপ করে ছিল। বিদ্যুতের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে যেন কাঁপছিল। বিদ্যুৎ বলেছিল, তখন, মীনা তখন ?

মীনাক্ষী শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলেছিল, আমি জানিনে বিদ্যুৎ, আমি জানিনে।

তখন কী হবে ? কী যেন হয় ? তরল সহজ অতি সাধারণ কতগুলি চিন্তা অস্পষ্ট জটায় এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। দুজনের কেউ তারা ভাবতে পারেনি। শুধু যখন ঘটবে, তখনই তারা অনুভব করবে। শুধু অনুভব, তখন ভাবতে হবে না।

না, আর এ ঘরে নয়। এ ঘরে আর থাকতে পারছে না বিদ্যুৎ। হয় তো এরা সব মাতাল। কিংবা মাতাল নয়। কী আসে যায় ডোমন চক্রবর্তী, লকা, সোনাদের রহস্যে। বিদ্যুতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাজসিদ্ধির জীবনচক্রে এরা ঘুরছে, ঘুরবে চিরদিন। সে চলে যাবে। এখনো রুদ্রভৈরবের মন্দির চেনা হয়নি তার। আর সময় নেই বেশী।

ডোমন বলে উঠলেন, চুপচাপ ক্যানে বাবা ? তুমাকে ইখানে ডেকে লিয়ে এসে মনটো খারাপ করাা দিলম গ ?

বিদ্যুৎ বলল, না না, তা' নয়। আমি একটু বেড়িয়ে আসি। গ্রামটা ঘুরে আসি একটু।

ডোমন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, হঁ—হ বাবা, যাও, ঘুরে আস। ছ'টো প্রতিমা আছে, দেখ্যা আস গ। বসে ক্যানে থাকবা। অ্যাই লকা, ই দাদাবাবুকে লিয়ে যা। আমাদিকের ছ'টো বাড়ির ছ'টো ঠাকুর দেখায়ে লিয়ে আয়।

বিদ্যুৎ বলে উঠল, একলাই পারব।

—না বাবা, পারবেক নাই। বাজসিদ্ধির আন্ধারের রাস্তাকে বিশ্বাস নাই বাবা। আমাদিগের ভুল হয়্যা যায়।

লকা বলে উঠল, হঁ, রাজাসিধির আঁধারকে বিশ্বাস নাই। একটো গরুর গাড়ি একবার আমাকে ভুল পথে লিয়ে গেলছিল। জানেন গ বড়কত্তা ?

—না।

—লিয়া গেল্‌ছিল। কাঁদরে লিয়া ফেলাইছিল। গরুর গাড়িটো আর দেখি নাই।

এসবই মাতালের প্রলাপ কিংবা স্ব-সম্মোহিত মানুষদের স্বপ্নের কাহিনী। কিন্তু বাজসিদ্ধির ঘোর কুটিল অন্ধকারের মধ্যে যে বিদেহী অদৃশ্য হাতছানিতে মানুষকে কুপথে নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে ঘাড় মটকে গুঁজড়ে ফেলে রাখে মাঠে কাঁদরে, বিদ্যুৎ আজ স্বয়ং তারই সহচর। পৃথিবীর কোন ভয়কেই আর ভয় নেই। শক্তিকে জাগিয়ে তোলার অপেক্ষা শুধু।

বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বাজসিদ্ধির রুদ্রভৈরবের মন্দিরটা কোথায়?

ডোমন হেসে বললেন, তুমি কুথা শুনলে বাবা মন্দিরটোর কথা?

বিদ্যুৎ বলল, বইয়ে ছবি দেখেছি।

—ছবি। হঁ, অনেক লোকে ভৈরব মন্দিরের ছবি লিয়ে গেলছে?

ডোমন চক্রবর্তীর চোখ দুটি গর্তের ভিতর থেকে উপছে পড়ল। চারপাশের রেখাগুলি সরে গিয়ে দৃষ্টিকে পথ করে দিল। স্থান এবং কালের স্রোত বেয়ে বেয়ে, সে-দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে গেল। সেই নিরুদ্দিষ্ট দূর থেকে ডোমনের গলা শোনা গেল, বাজসিদ্ধির সি মহাক্ষণটোর কথা আমাদিগের ঠাকমার মুখে শুনছি। ঠাকমারা তাঁদিগের শাশুড়িদের কাছে শুনেছে। বাজসিদ্ধির মহারানী লীলাবতী মন্দিরটো পিতিষ্টে করেছিলেন।

লকা বলে উঠল, মহারানী আপন বুকের অক্ত দিয়া মন্দিরটো বানায়ছেলেন।

—হঁ। মহারানী মন্ত্রীকে, সেনাপতিকে ডেক্যা বুইলছিলেন কি, 'মানুষ হাজার পুণ্য করুক, পাপটো তার বুকে ঘুমায়ে থাকে। রুদ্র-ভৈরবকে আমি আমার বুকের রক্ত দিব হে, তাঁর মন্দির করব।' ত বাজসিদ্ধির ঘরে ঘরে সব্বাই কেঁদেছিল।

রক্ত দিবার কথা শুনে সবাই কেঁদেছিল। ক্যানে? না, মহারানী লীলাবতী অনেক পুণ্যি করেছিলেন। দান, ধ্যান, মন্দির পিতিষ্ঠে, প্রজাদিগের সুখের জন্যে জলকর, সব দিইছিলেন।

লকা বলল, মহারানী একাধারে রাজা আর রানী ছেলেন।

—হুঁ। মহারাজের অসুখ ছিল। কুনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নাই।

—আর, হুঁ বড়কত্তা, তখন কাশী থিক্যা আপনকাদের গুরুদেব এসে থাকতেন এই রাজসিধিতে?

—হুঁ, বাজসিদ্ধিতে তখন আমাদিগের গুরুদেব এসে অনেক বছর ছিলেন। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান।

—আ! সাক্ষাৎ ভগবান! শুনিচি, উনি মহাদেবের মতন ছিলেন। মন্তর দিয়া দেবী জাগাতে পারতেন। ভূত পেরেত লাচাতেন।

—হুঁ, আমাদিগের দেবী বাজ-বাহিনীর সঙ্গে উনি কথা বলতেন।

—আমাদিগের মহারানীর সেবা ছাড়া, কারুর সেবা গুরুদেব লিতেন না!

—মহারানী পুণ্যবতী।

—আর গুরুদেবের আদেশে আমাদিগের মহারানী কুনদিন সোনা দানা গায়ে তুলেন নাই। শাঁখা, লোয়া, সিঁদুর আর লাল মাটিতে আঙানো লাল পাড শাড়ি। আঃ! মহারানী ভৈরবী ছিলেন গ বড়কত্তা।

—দেবী।

—আর সেই বড়কত্তা, মন্দির পিতিষ্টের কথা শুনে, গুরুদেব কুথাকে চলে গেলছিলেন।

—হুঁ। রুদ্রভৈরবের মন্দিরের কপালের সি একটো পাথর আছে, তাই আনতে গেলছিলেন।

বিদ্যুৎ যেন তার সামনে, কালো ধলা দুটি মানুষের মিলিত এক বিচিত্র রূপকথা শুনছিল। দুটি মন্ত্রমুগ্ধ মানুষ, দূর কালের সীমায়

বসে বলছিল। কিন্তু পাথরের কথা শোনা মাত্র তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, পাথর ?

ডোমন বললেন, হঁ বাবা, পাথর। দেবী বাজবাহিনীর সংকেত বার্তা, রুদ্রভৈরব তাঁর মাথায় লিয়ে বসে আছেন। সি আমাদিগের বুঝবার লয় বাবা।

লকা বলল, গুরুদেব সি পাথরটো লিয়ে আসলেন। তা' পরেতে সেই মহাক্ষণটো হল।

—হ। রক্ত দিবেক শুনে জ্ঞাতি কুটুম বারণ করলেক, কত কাঁদলেক।

—কিন্তক মহারানীর হুকুম—

লকাও যেন ডোমনের সঙ্গে সেই নিরুদ্দিষ্ট দূর থেকে বলে চলেছে।

ডোমন বললেন, হঁ, মহারানীর হুকুম। মন্দিরের ভিত কাটা হল। গণ্ডূষ-ভরা রক্ত মাটির পাত্রে লিয়ে লীলাবতী দিইছিলেন আপন বুকটো কেটে। বাজসিদ্ধির সকল মেয়্যালোকেরা রাজবাড়িতে মহারানীর সাম্নে দাঁড়িয়েছিল। সকলে অজ্ঞান হয়্যা গেলছিল।

লকা বলল, হঁ, যোবতী মহারানী উঁয়ার পাপটো রুদ্দরের পায়ে দিছেলেন।

ডোমন গলা তুলে বললেন, লীলাবতী কখনো পাপ করেন নাই।

লকা বলল, অক্ত ক্যানে দিলে তবে ?

—মন রইলছিল !

একটা অমানিত ঋজুতায় লকা ঘাড় সোজা করে বলল, পাপ করলে মন বুলে।

ডোমন চীৎকার করে উঠলেন, খবদ্দার ! খবদ্দার লকা !

ডোমনের গা থেকে থান খসে পড়ল। লকার মতো তাঁর শরীরও শক্ত। এ বয়সেও বলিষ্ঠ পেশী পাথরের মতো খোঁচা খোঁচা। বুকটা টকটকে লাল। মুখ আগুন। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, তুর জিভ ছিঁড়ে লিব আমি।

লকা মাথা নামাল না। গোঙানোর মতো শোনাল তার গলা, আপুনি আজা ?

—হঁ, রাজা।

প্রায় চাপা গলায় গর্জে উঠলেন ডোমন।

—আমি পেজা ?

—হঁ, তু প্রজা।

—আপুনি লকার জিভটো ছিঁড়ে লিবেন ?

যেন বিস্ময়ে করুণ শোনাল তার গলা।

অসহায়ের মতো এক পা পিছিয়ে এলেন ডোমন চক্রবর্তী। আবার এক পা এগিয়ে গেলেন। বিদ্যুৎ বুঝতে পারছিল, কোথায় আঘাত লেগেছে ডোমনের। লীলাবতীর পাপ! একথা তাঁর সামনে উচ্চারণ করাও পাপ। মহাপাপ। বাজসিদ্ধির সুদিন থাকলে, লকার হয়তো মৃত্যুদণ্ড হত। কিন্তু লকাকে সে গৌরবান্বিত দেখছিল। নির্ভয়, সাহসী এবং সত্যবাদী।

বিদ্যুৎ দেখল লকার চোখ শান্ত। কিন্তু গলার গোঙানিতে একটা উত্তেজনা ফুটে উঠল, বড়কত্তা!

ডোমন জবাব দিলেন না।

লকা বলল, মাহারানী আমাদিগের দেবী। বড়কত্তা, মাহাভারতের দুরপদী ঠাকুরণ লরকে গেলছেন, আপনি না বুইলছেন গ? উয়াঁকে আমরা দেবী বলি। আমাদিগের মাহারানীটো দেবী ছেলেন। আমার বুকটো কেটে আমি অক্ত দিতে পারি না, আমার পাপটো থাকে। আপুনি পারেন না। রাজাসিধির আজা পেজা পারে না। আপুনি আমার জিভ ক্যানে ছিঁড়ে লিবেন? পুলিসের দারোগা এসে আপুনিকে ধর‍্যা লিয়া যাবেন ক্যানে? আঁ?

ডোমন থেমে পড়েছিলেন। বসে পড়েছিলেন চেয়ারে। আর লকার কথাগুলি বিদ্যুতের মনে সায় দিচ্ছিল। শেষের কথাটা নিষ্ঠুর হাসির মতো সত্য।

ডোমনের গলা আবার শোনা গেল, তু চুপ যা।

—আমি চুপ যাব বড়কত্তা। আপুনি আমার জিভটা ছিঁড়ে লিবেন। আপনাদের হাত আনেক লকা বাউরির জিভ উপড়ালছে। রাজাসিধিতে আমার এক হাত জমি নাই। আমার আপন ভিটাটো গেল্ছে। আমার জিভ আপুনি কুথা পাবেন গ যে ছিঁড়ে লিবেন? আমার জিভ নাই।

ডোমন শান্ত হয়েছিলেন। আবার অস্থির হলেন। বললেন, তু চুপ কর লকা।

—আমি চুপ করব। বড়কত্তা, আপনকার জিভটো লিয়া টানা পোড়ন হচ্ছে, আমি দেখি গ।

লকার গলার স্বর যেন অতলে ডুবে গেল। একটা নিঃশ্বাস শুধু উঠে এল সেই অতল থেকে। ডোমন চক্রবর্তীর গলায় একটি অস্ফুট আর্তনাদ ফুটে উঠল। আতঙ্কে তাঁর চোখ তুটি আবার গভীর গর্তে ঢুকে গেল।

ঘরের দরজা নড়ে উঠল। বাতাস ঝাপটা খেয়ে ঘরে ঢুকল। হ্যারিকেনের শিখাটা উঠল দপদপিয়ে। আর ঠিক মাথার ওপরে, পাতার ছাউনিতে বসে যেন মেঘ গুরু-গুরু ডাক দিল।

লকার গলা আবার শোনা গেল, মাহারানীটো আমাদিগের দেবী। ই গাঁয়ের আজাদের বুকে আর অক্ত নাই। মাহারানীর পুণ্যিটো আপনি লিলেন নাই বড়কত্তা। বার সাল আগের কথাটো আমার মনে পড়ছে।

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন ডোমন। তু'হাত নাড়িয়ে বললেন, না না, উ আমি পারবেক নাই। রাজসিদ্ধির সকল মানুষের পাপের ভার লিয়ে রুদ্রভৈরবের মন্দিরটো রইচে, উথ্যানে আমি হাত দিতে পারবেক নাই।

বিত্যুৎ তার সমস্ত আচ্ছন্নতাকে ঝেড়ে ফেলে সজাগ হল। সে বুঝতে পারছে এ ঘরে, এ পরিবেশে, এই মানুষদের মধ্যে আর তাদের জীবনের চক্রে, সে তলিয়ে যাচ্ছে। রুদ্রভৈরবের মন্দিরের আর এক নতুন দিগন্ত যেন দেখা দিল ডোমন আর লকার

কথায়। মন্দিরে হাত দেবেন কেন ডোমন? আর দেবেন না-ই বা কেন?

লকা বলল, কিন্তুক রুদ্দুরকে জঙ্গলে খাচ্ছে।

—রুদ্রকে জঙ্গল খেতে পারবেক নাই।

—দখিন লদীটোর পাড়ে, শ্মশানের কাছকে, গাঁয়ের গরুগুলানও অখুন যেতে ডরায়।

এবার ডোমন হাত নাড়লেন না, মাথা নাড়লেন না। বললেন, আমি পারবেক নাই।

ডোমন চক্রবর্তীকে আলোকিত, সুন্দর, মহৎ মনে হতে লাগল। .যেন সমস্ত অন্ধকারের উর্ধ্বে কেমন একটি মহান্ দেবতার মতো মনে হচ্ছে। যদিও এসব সম্ভব নয়। লোকটিকে বিদ্যুৎ অনেকক্ষণ থেকে দেখছে। এই রাত্রি আর এই পরিবেশ তার মনের ওপর, তার চোখের ওপর, একটি নিরবচ্ছিন্ন অবিশ্বাস্য খেলায় খেলছে। বিদ্যুতের অস্তিত্বকে চুরি করতে চাইছে। তা সে দেবে না। সে উঠে দাঁড়াল।

লকা বলল, কিন্তুক বার সাল আগের কথাটো আমার মনে পড়ছে।

ডোমন হাসলেন।—গাধা, তু গাধা লকা। ই রাজসিদ্ধিটোকে গ্যাখ ক্যানে, আমাকে গ্যাখ ক্যানে।

—আপুনি বড়কত্তা।

—হুঁ, কিন্তুক তু আপন মুখে বুইলছিস, আমার জিভটোকে তু টানাপোড়েন হতে দেখিস!

—ক্ষ্যামা গ্যান গ।

—না, তু ঠিক বুইলছিস। ভৈরব যদি জঙ্গলে ঢোকেন, মাটিতে বসেন, সি তাঁর ইচ্ছা! পরের বুকের রক্ত লিয়ে আপন পুণ্যি হয় না।

—হেঁয় গ বড়কত্তা, আপনকার কী হবে?

—উ কথা থাক।

বলে বিদ্যুতের দিকে তাকালেন। আবার হাসলেন, আবার বিব্রত হলেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আ, ছি ছি, আ-রে, অ্যাই লকা, গ্যাখ কত্ত দেরী হয়্যা যেইছে। যা যা, দাদাবাবুর সাথে যা।

কাছে এসে বিদ্যুতের গায়ে হাত দিলেন।—যাও বাবা, ঘুর‍্যা আস। বিষ্টি আসতে পারে, তাড়াতাড়ি ঘুর‍্যা আস গা।

বিদ্যুৎ পকেটে হাত দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল। ডোমন চক্রবর্তীকে ঘিরে আলোকচ্ছটা যেন বেড়ে উঠেছে। মুখটি হঠাৎ চেনা চেনা লাগল। এমনি প্রশান্ত, হাসিমাখা, শান্ত, আচ্ছন্ন চোখ তার খুব চেনা চেনা মনে হল। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। সে বাইরে বেরিয়ে এল। ডান পকেট থেকে বার করল টর্চ-লাইট। বোতাম টিপল। ছোট গোল বৃত্তের বুকে খানিকটা লাল রং জেগে উঠল। মাটি। মাটি আর ছোট ছোট কাঁকর।

বিদ্যুতের নাকে এসে গন্ধটা লাগল আবার। এই আড়ালটুকুর কী দাম আছে? সামনে খেলেই বা ক্ষতি কী? হয় তো ওইটুকু রাজার মান। গোপন তো করেনি। যদি জানতেন বিদ্যুতের মতো কলকাতার ছেলেরা অন্ধকারের সবটাই জানে, তাহলে হয়তো ডাক দিতেন। সঙ্গে নিয়ে বসতেন।

লকা বেরিয়ে এল।—চলেন গ দাদাবাবু।

বিদ্যুৎ বলল, তুমি গায়ে কিছু দেবে না?

—পেয়োজন দেখি না। শীত কুথা?

এখন শীতবোধ নেই লকার। সে হন্‌হন্‌ করে চলল। বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, ঠাকুর ক'খানি আছে লকা?

—আজ্ঞে ছয়খানা। আজাদের আটঘর, দু'ঘর তুল্যা দিইচে, আর পারে না। ই ছ'ঘরও আস্তে আস্তে দিবেক।

লকার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গেল বিদ্যুৎ। সেই একই প্রতিমা। একই পরিবেশ। উৎসবের আয়োজন কোথাও কম, কোথাও বেশী। বোঝা যায়, বিদেশ বিভুঁয়ের শহরে যারা ভাল চাকরি-বাকরি করে, তাদের বাড়িতেই উৎসবের ঝলক বেশী। নগদ কড়ির ঝিলিক সেখানে। প্রবাসের সারা বছরের কাজ শেষে, কেরানী, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, রেলের টিকিট কলেক্টর, গার্ড আর কারখানার মিটার, ওয়াইণ্ডার, অপারেটাররা, এমন কি গেজেটেড আর ননগেজেটেড দু-

একজন অফিসারও তাদের সব পরিচয় ফেলে, আজ বাজসিদ্ধির রাজা হয়ে এসেছে। বাজসিদ্ধিতে তারা রাজা। বাইরের পরিচয় যাই হোক। 'বিদেশে চাকরি আর ব্যবসায়ে যাদের অবস্থা যত ভাল, তাদের বাড়ির উৎসব তত জমকাল।

এখন বোঝা যায় হংসেশ্বর না আসায়, নিজের ছেলে না আসায়, গগনেশ্বর কেন ব্যথিত। শরিকদের মধ্যে, ওটাও একটা রেশারেশির ব্যাপার। কিন্তু উৎসবের বাড়ি বাড়ি যাবার জন্যে বিদ্যুৎ বেরোয়নি। শুধু রুদ্রভৈরবের মন্দিরটা কোথায় জানতে চায় সে।

লকার সঙ্গে তাকে দেখে সবাই তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। পরিচয় পেয়ে সবাই বিদ্যুৎকে বসতে বলল। লৌকিকতায় কেউ-ই কম নয়। প্রবাস থেকে বাজসিদ্ধিতে এসে সকলেই উদার হয়ে ওঠে। কারণ যার যত আতিথেয়তা, সে তত বড়, তার রাজসিকতা ততই মহৎ। কিন্তু বৃষ্টি আসতে পারে, সেই দোহাই দিয়ে বিদ্যুৎ চলে এসেছে।

শুধু লকা মাঝে মাঝে বলে উঠেছে, হঁ, ই-টো রাজাসিধি। আর গ্রামের পথে পথে সাঁওতাল মেয়েপুরুষদের দেখল, অন্ধকারে গায়ে কাপড় দিয়ে শুয়ে আছে। তর্জিত খোলা আকাশের তলায়, মেঘ-মুখে-করা বাতাসে, ভেজা মাটিতে, অন্ধকারের সঙ্গে মিশে দলা দলা পড়ে আছে। বলির পশুরা আছে তাদের সঙ্গে। পশুগুলির আজ কালরাত্রি, কাল তাদের মুক্তি। কিংবা আজ রাত্রেই। শেষ আহারের পাতা মাঝে মাঝে খসখসিয়ে উঠছে তাদের মুখে। ডেকে উঠছে কখনো সরু কাঁপা কাঁপা গলায়। হয়তো ওদের মা'কে ডাকে, কিংবা পালক-মানুষদের কিছু জিজ্ঞেস করে। আর মানুষেরা বলে, রাত্রে ছাগল ডাকলে বৃষ্টি আসে।

সাঁওতালরা অনেকেই ডোমন চক্রবর্তীর অবস্থায়। তৈরী পানীয়-পাত্র ওদের সঙ্গেই আছে। কেউ মাদলে চাঁটি মারছে! স্খলিত, সহসা সে শব্দ যেন ভুল প্রহরের মতো বেজে উঠছে। কেউ ফুঁ দিচ্ছে বাঁশীতে। ঘুমিয়ে রয়েছে অনেকে। বলির প্রহরের প্রতীক্ষা সকলের।

গ্রামের প্রান্তে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল বিদ্যুৎ। উঁচু জায়গা। লম্বা সরু দেহ, জটার মাথা মূর্তির মতো সামনেই এলোমেলো কতগুলি তালগাছ। বেশ খানিকটা দূরে আগুন জ্বলছে। সর্বব্যাপ্ত নিকষ অন্ধকারকে যেন চেটে খেতে চাইছে লেলিহান শিখা। আগুনের কাছাকাছি দু'একটি অস্পষ্ট মূর্তি দেখা যায় ছায়ার মতো।

বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, ওটা কি শ্মশান?

লকা বলল, না। তবে চিতা বুইলতে পারেন দাদাবাবু, লিশার চিতা। সাঁতালিরা পচুই জ্বালাচ্ছে। কাল লিশা করবে, লাচবে। সিটো দেখতে আপনার ভাল লাগবেক।

হয় তো লাগবে, কিংবা লাগবে না। তার জন্যে কিছু যাবে আসবে না। বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, শ্মশানটা কতদূর লকা?

লকার কথা থেকেই টের পেয়েছে বিদ্যুৎ শ্মশানের কাছে রুদ্রভৈরবের মন্দির।

লকা বলল, শ্মশান ক্যানে গ দাদাবাবু। কাছেই, দুই পাহাড়ের মতন গাছগুলান দেখা যায় আঁধারে, দ্যাখেন ক্যানে।

লকা আঙুল তুলে দেখাল। বিদ্যুৎ লক্ষ্য করল। ঠিক তার পিছনেই, তালগাছের ওপারে, অন্ধকারের বুকে জমাট কিছু পড়ে আছে নিঃশব্দে। অস্পষ্ট ক্ষীণ তার সীমারেখা। কালো আকাশের বুকে গাছের ঝুপসি-ঝাড় স্পষ্ট রেখায় ফুটে ওঠেনি।

লকা বলল, ওথ্যানে দখিন লদীটোর পারে রাজাসিধির শ্মশান।

বিদ্যুৎ বলল, আমি যাব ওখানে লকা।

লকা বলে উঠল, না দাদাবাবু, বড়কত্তা আমাকে গাল দিবেক গ।

বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লকার মুখের দিকে। অসুরটার চোখ দুটি মোষের মতো দেখাচ্ছে। বাঁ পকেটে হাত দিল সে। বলল, তোমার কথা শুনে রুদ্রভৈরবের মন্দিরটা আমার দেখতে ইচ্ছা করছে লকা।

—কাল সকালে দেখবেন ক্যানে দাদাবাবু।

—না, কাছাকাছি এসেছি যখন, এখনই দেখে যাই।

তারপর বিদ্যুৎ লকার দিকে ফিরে আবার বলল, তোমার কথা শুনেই আমার আরো দেখতে ইচ্ছা করছে। তোমাদের রুদ্দুরের মন্দিরটা আমি দেখব।

লকার গলার হাসি শোনা গেল। বলল, আপুনিও খ্যাপা গ দাদাবাবু। ডর লাগবেক নাই আপনার ?

ডর ? পোড়ো মন্দিরের রুদ্রভৈরব তো অনেক দূর। বাজসিদ্ধিতে যারা মরে, তাদের সেই শ্মশানের চেয়ে কলকাতার জীবন্ত শহর আরো অনেক কঠিন, নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর। বিদ্যুৎ সেখান থেকে এসেছে। সে বলল, ভয় কেন লাগবে ?

—আপুনি শহর থিক্যা আসছেন দাদাবাবু।

শহরকে এরা চেনে না। বিদ্যুৎ বলল, শহরের লোকেরা এসবে ভয় পায় না। দেবতার মন্দির তো।

—চলেন।

এগিয়ে গেল লকা। টর্চের গোল বৃত্ত আলোটা যেন জোনাকীর মতো ক্ষুদ্র মনে হল এই অন্ধকারে। লকা বলল, তালগাছের ধাক্কা বাঁচায়ে আসবেন গ।

হ্যাঁ, প্রহরীর মতো তালগাছ। বাতাসে দুলছে, পাতার ঝাপটা দিয়ে যেন অন্ধকারকে মারছে, ধমকাচ্ছে, আর বাতাস কাটছে তার তীক্ষ্ণ ধারে।

এবার, এবার সেই ঈপ্সিত, মহামূল্যবান জিনিস দেখবে বিদ্যুৎ। মুক্ত কলকাতার প্রবেশপত্র, বাবা মায়ের বন্ধুদের স্নেহের ছাড়পত্র, আর মীনাক্ষী, যে সাহস করে বলতে পারেনি, সে যখন ফিরে যাবে, তখন কী হবে !

বিদ্যুৎ ডাকল, লকা !

লকা দাঁড়িয়ে পড়ল।—বলেন।

—তুমি তখন বারো বছর আগের কথা কী বলছিলে ? বড়কত্তাকে যে বলছিলে ?

—সি একটো কথা দাদাবাবু।

—বলা যায় না বুঝি ?

লকা চুপ। তার পাশাপাশি চলছে বিদ্যুৎ। লকার নিঃশ্বাসের গন্ধ মাঝে মাঝে লাগছে। তাঁলগাছের জন্য আস্তে আস্তে চলছে। তারা।

লকা বলল, বড়কত্তার কথা আমি কী বুইলব বাবু। তাঁর সব আমি জানি। আমার কপালটো খারাপ, বাউরির ব্যাটা আমি। যার কেউ নাই, সব আমি জানি। রাজাসিধির লোকে জানে না। দাদাবাবু—

—বল।

—আমাদিগের বড়কত্তাটো মনে মনে আজা।

তাই নাকি ?

—আবার কি ? দাদাবাবু, আপনি অনেক নেকাপড়া জানেন। খালি টাকা থাকলে, জমিনদারি থাকলে কি নোকে আজা হয় ?

—না।

—ত, সি কথা।

গলার স্বর নেমে গেল লকার, যেন কেউ শুনতে পাবে এই প্রেত-প্রান্তরের অন্ধকারে। চুপি চুপি বলল, আজাদিগের কুন-তরফে আর পায়ের তলায় মাটি নাই। ধন, দুলত কুথা গেল্‌ছে। অখুন বোরেগীর আলখ্যাল্লার ফালি-ফালি, তালি-তালি জমিন ভরসা। কারুর ঘরকে সোৎসালের খোরাকী লাই। ত বারো-সাল আগে, আড়াই হাজার ট্যাকায় বড়তরফের সব মুচলেকা পড়ে যেইল মাত্তর আড়াই হাজার ট্যাকায়। কিন্তুক কাদের জন্যে, ইটো কেউ দ্যাখে না। শহরকে যেইয়ে বসে রইল ভাই ব্যাটা। কিন্তুক রাজাসিধির ট্যাকা না হলে উয়াদের চলে না। মেয়্যাগুলনের বিয়ে বলেন, আর বছর বছর বিয়েন বলেন, সব খরচ ইখ্যান থিকে। ব্যাটার বউ বিয়েন-ব্যামোয় পড়ল, খরচ যেইল ইখ্যান থিকে। কলকেত্তায় ভাইয়ের বাড়িতে পিতি মাসে দু'বস্তা করে চাল যায়।

ইয়ার আর নড়চড় হবার উপায় নাই। কিন্তুক আমাদিগের বড়কত্তার মুখে রা-টি নাই। সবাইয়ের সব কিছু হল্‌ছে। পূজা-পাট, খাওন-দাওন, ভেট, পেনামী, তত্ত্বতাবাস। কুথা থিক্যা কী হন্‌ছে, কেউ জানে নাই। ত বারো সাল আগে, মাত্তর আড়াই হাজার ট্যাকায় মহাজনদের হাতে সব মুচলেকা পড়ে যেইল। বড়কত্তার অখুন সাঁপের পিঠে পা গ দাদাবাবু। পা তুলতে লারছেন, রাখতে লারছেন। কখন ছোবল খান, কখন ছোবল খান। সি ভয়টো মারছে উয়াঁকে।

কিন্তু আসল কথার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক। এসব কথা কে শুনতে চেয়েছে লকার কাছে। রাজারা যে আজ প্রজার মানটুকুও পাচ্ছে না, সে তো দশ বছর আগেই জেনে গেছে বিদ্যুৎ। সে চুপ করে রইল। শ্মশানটা যত কাছে ভেবেছিল, তত কাছে নয়। ক্ষীণরেখা জমাট অন্ধকারটার দূরত্ব কম নয়।

লকা আবার বলল, ত সি কথা দাদাবাবু, রাজাসিধি গাঁটোর আনাচে-কানাচে আজা-রা ট্যাকা রেখ্যা যেইচেন গ।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

—হঁ দাদাবাবু। বারো-সাল আগে যখন সব মুচলেকা পড়ল, তখুন একটো বাঙালি সায়েব এল হুমকায়। বড় সায়েব। ম্যাজিস্টোর হবেন ক্যানে, জানি নাই। সায়েব রাজাসিধিতে খুব আসতেন, বড়কত্তাকে আজা মানতেন। ত, ই রুদ্দুরের মন্দিরের গায়ের ছাঁচের ইটগুলন, দেবতাদিগের মতো ঘটনা সব উ-তে ছাপান আছে। পোড়া ইট....।

বিদ্যুতের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে। তীব্র উগ্র কৌতূহলে তার দেহের ভার বেড়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল প্রায় সে।

লকা বলল, দাঁড়াবেন না, এসে পড়ছি। ত সি সব চেয়ে বড় ইটটোর গায়ে পাঁচো পাণ্ডো আর দ্রুরুপদী ঠাকরুণের স্বর্গ যাত্রা মূর্তি আছে। তা হ্যাখেন ক্যানে, মাহারানী ঠিক করেছিলেন, না

কি দাদাবাবু? উতে বোঝা যেইল কি, দেবতার মনেও পাপটো আছে।

—তারপর?

চাপা উত্তেজিত শোনাল বিদ্যুতের গলা।

লকা বলল, ত সি সময়ে, বড় সায়েবটোর কি খেয়াল হল, উই পোড়া ইটগুলন চাইলেন। বুইল্লেন,' আজ্ঞা মশায়, আমাকে গোটা মন্দিরখানি আপুনি বেচে দেন। মন্দিরের গা থিক্যা ইটগুলন খুলে দিতে বুইল্লেন। বড়কত্তা হাত জুড়লেন। বড় সায়েবটো আড়াই হাজার ট্যাকা দিতে চাইলেন। আমাদিগের বড়কত্তা মুখ ঢাকা দিলেন গ। বড় সায়েবটো কত বুইল্লেন, আজ্ঞা মশায়, ইতো আপুনিরা রাখতে লারবেন, লষ্ট হয়্যা যাবেক। বেবাক লষ্ট হয়্যা যাবেক। আমাকে দেন, গোটা মন্দিরটো তুলে লিয়ে গে আমি যতন করে রাখব। ত আমাদিগের বড়কত্তা, মুখ ঢাকা দিয়ে মাথা লারলেন। সায়েবের কাছকে ক্ষ্যামা চাইলেন। ত লাচার হয়্যা চলে যেইলেন সায়েবটো।· কিন্তুক আবার আসলেন। আরো তিন চারটে সায়েবকে লিয়ে, মন্দিরটো দেখে, বড়কত্তাকে বুইল্লেন, আপনকাদের মন্দিরটো গরমেণ্ট দেখভাল করবেন। তা' পর, কয়েক মাস বাদে, সরকারের লোকজন এসে, জঙ্গল টঙ্গল সাফ করে, একটা টিনের পাতের উপর ছাপা লুটিশ খাড়া করে দিয়্যা গেল। কী সব নেকাপড়া হল বড়কত্তার সঙ্গে। লুটিশে নাকি লেখা আছে, মন্দিরটোকে কেউ লষ্ট করলে উয়ার শাস্তি হবেক। কিন্তুক ই দ্যাখেন ক্যানে দাদাবাবু, মানুষে কথা শোনে, জানোয়ারকে বোঝালে সেও বোঝে, জঙ্গল কি কারুর কথা শোনে? উয়াকে বংশ উজাড় করে কাটতে লাগে।···দ্যাখেন, হাজারখান জিভ বার করে রুদ্দুরকে জঙ্গল বেড় দিয়েছে। মন্দিরটো যেমন ছিল তেমনি রইচে।

আমার জন্য, আমার জন্য। মনে মনে বলে উঠল বিদ্যুৎ। হয় তো লকার চেয়েও বেশী রক্ত ছুটে এসেছে তার চোখে। তার নিস্তরঙ্গ শান্ত কপালে দূরদর্শী রেখায় হিজিবিজি খেলে গেল। সে

মনে মনে বলল, আমার জন্যে, আমার জন্যে, আমার জন্যে। আমার ভাগ্যরেখা ধরে বারো বছর আগে চুমকার বড় সাহেবকে ফিরতে হয়েছিল। আর সেই রেখা ধরে আমি এসেছি। সে কারুর অনুনয়ের মুক্ত-হাত দেখবে না, হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দেখবে না। যে কোনো ন্যাশনাল মনুমেণ্টের নোটিশ, আইন অনুশাসনকে মানবে না। এককালীন আড়াই হাজার নয়, সারা জীবনের নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা।....

হঠাৎ থমকে গেল বিদ্যুৎ। দুটি চোখ তার সামনে। অন্ধকারে, দুটি চোখ তার সামনে। অন্ধকারে, দুটি আকর্ণ বিস্তৃত চোখ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন। কার চোখ? এ কার চোখ তার অদৃশ্য মনটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে? সেই কালী প্রতিমার? না কি আভার? কিংবা মীনাক্ষীর উৎকণ্ঠ সতর্ক চোখ বিদ্যুৎকে পাহারা দিচ্ছে? বিদ্যুতের চোখকে, মনকে কি পাহারা দিচ্ছে মীনাক্ষী, যাতে তাকে দেখে আর কথা শুনে কেউ ধরতে না পারে? তাকে চোখে চোখে আগলে রেখেছে বুঝি মীনাক্ষী। আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নির্বিঘ্নে, তারপর···তারপর, সন্ধ্যাবেলায় সেই দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে। সেই বিস্ময়কর আশ্চর্য এক স্বপ্নের ঘরের দরজার ফাঁকে দুটি প্রতীক্ষামগ্ন চোখ। কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ সব অতীতকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোটরের মুখে পক্ষিণীর মতো মীনাক্ষী। বিদ্যুৎ ঘরে ফিরছে।···

লকা বলল, বড়কত্তা আপন হাতে গোড়া কাটলেন। কে বুইলতে পারে দাদাবাবু, মাহারানী তাঁর শক্তি দিয়্যা পাঠায় নাই বড় সায়েবটোকে? লইলে সায়েবটোর উ খেয়াল ক্যানে যাবে? ত বড় তরফটা সি ডুবল।

বিদ্যুৎ মনে মনে বলল, আমি ভাসব, তাই বাজসিদ্ধির বড় তরফ ডুবেছে। পাপ নেই, পুণ্য নেই, এই নিষ্ঠুর নিয়ম। একজন ডোবে, আর একজন ভাসে।

দাঁড়াল লকা। সামনেই জঙ্গল, একটি জটপাকানো ঝুপসি। বোধ হয় বটগাছ মাথার ওপরে। কুটকুটে অন্ধকার। পাখী ডানা ঝাপটা দিচ্ছে। যেন সন্দেহবশতঃ ঝিঁঝি বিরতি দিচ্ছে থেকে থেকে।

—নাইট মারেন গ দাদাবাবু, সামুখের উঁচা ঢিপিটোয় মারেন।

বাতি ফেলল বিদ্যুৎ। একটি বৃহৎ রক্তচক্ষুর মতো লালচে আলোর সীমায় বাতাসলাগা লতাগুল্ম কাঁপছে, দুলছে। তার ফাঁকে ফাঁকে রক্তবর্ণ ইট। বিস্মৃতপূর্ব যুগের ভঙ্গিমায় দেবদেবীরা অভিশপ্ত, স্তব্ধ, অনড়। সেই খণ্ডটি কোথায়? সেই বৃহত্তম পোড়া ইট খণ্ড, পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী যেখানে শেষ ঘুমের কোলে ঢলে আছে। আর সেই প্রস্তর খণ্ড, দেবী বাজকাহিনীর যে সংকেতবার্তা রুদ্রভৈরব তাঁর মাথায় নিয়ে বসে আছেন। সে জিজ্ঞেস করল, লকা, গুরুদেবের নিয়ে আসা সেই পাথর কোথায়? আর স্বর্গযাত্রা কোথায়?

—পাথর দরজার মাথায়। আর স্বগ্‌গো গমন দরজার ডান দিকে। আঃ, উ কি করেন গ দাদাবাবু, কুথা যেইছেন আপুনি?

বলতে বলতে লকা বিদ্যুৎকে আগলে অনুসরণ করল। বিদ্যুৎ এগিয়ে গেছে জঙ্গলের দিকে। লাইট ফেলল। মন্দিরের প্রবেশমুখ বন্ধ করে ঘনলতা মন্দিরের মাথায় উঠে গেছে। স্বর্গযাত্রা চিনতে পারছে না, উদ্ধার করতে পারছে না বিদ্যুৎ। সেই পাথরটাই বা কোথায়?

লকা বলল, অই অই গ, অই কি দুরুপদী ঠাকরুণ নাকি? ছ্যাখেন ক্যানে গ দাদাবাবু।

বিদ্যুৎ বুঝতে পারল না। সে আরো অগ্রসর হতে গেল। তার হাত ধরে ফেলল লকা।—আপনার মাথাটো খারাপ হয়্যা যেইছে দাদাবাবু।

যাচ্ছে, তাই যাচ্ছে, কিন্তু লকাকে তা বুঝতে দিলে হবে না। লকা বলল, ইথ্যানে সব আছে, কী নাই?

বিদ্যুৎ ঠোঁট উলটে বলল, সাপ?

—নাম করবেন নাই দাদাবাবু, আছে বটে কি? আপনার মাথার সমান খাড়া হয়্যা ফুঁস্যা উঠবেক। উয়াঁরা শিরদংশন করেন।

বাঁ হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরল শিশিটা। কিন্তু শিশিটা পিছলে যাচ্ছে। কেন? মুখের সীল দেখল। না, মুখ ঠিক আছে। তাহলে অনেক আগেই পুড়ত। হাত ঘেমেছে। জল জল হয়ে গেছে হাতটা।

—হেই, হেই শালো, যাঃ যাঃ!

লকা তাড়া দিয়ে উঠল। বিদ্যুৎ ফিরল চকিতে।—কী? কী ওটা?

শ্যাল গ দাদাবাবু। শ্মশানটো তো কাছকে। শালো জ্যান্তকে মরা ভাবলে নিকি? চলেন যাই দাদাবাবু, ইখ্যানে আর থাকে না।

বিদ্যুতের গলায় উত্তেজনা গোপন রইল না। সে চাপা রুদ্ধ গলায় বলল, কিন্তু পাথরটা? সেটা দেখতে পেলাম না তো? এটা ঠিক রুদ্রভৈরবের মন্দির তো? না কি?

বলে সে টর্চের গোল আলোয়, তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে মন্দিরের দেহ লেহন করতে লাগল যেন। আর অনড় নিশ্চল দেবদেবীর নানান বিভঙ্গে, নানান মুদ্রায়, বিচিত্রাসনে ঝলকে ঝলকে উঠল। তারপর, ওই উঁচুতে, দরজার মাথার সামনেই, লতাগুল্মের পাশ থেকে কালো কষ্টিপাথরের একটি অংশ দেখা পেল। যে-অংশে প্রায় সুস্পষ্ট একটি নারী-পুরুষ সংলগ্ন মূর্তি দেখতে পেল। নগ্ন, যেন মিথুনাসনে স্বপ্নাতুর, মগ্ন, আচ্ছন্ন। ওই সেই পাথর। যে দেবে তাকে···। পাওয়া গেছে। টর্চের আলো নেমে এল মন্দিরের দরজার ডান দিকে। এই! আর এই সেই স্বর্গগমন। মৃত্যুর ক্রমধাপের চিত্র। প্রথম ধাপে দ্রৌপদী, তারপর সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম, কুকুরের ধর্মবেশ, আর ইন্দ্রের আগমন। সবশেষে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন। পাপ থেকে কারো মুক্তি নেই। মহাভারতের পুণ্যের যুগে ছিল না! এ যুগেও নেই। বাজসিদ্ধির লীলাবতীর ছিল না। ডোমন চক্রবর্তীর নেই। বিদ্যুতেরা এ যুগে পাপ পুণ্যের বিচার করে না। যেমন করে হোক, বেঁচে থাকাই পুণ্য। আর সেই পুণ্যেরই দুঃসাহসে, এই ইট আর পাথর খসিয়ে নিয়ে যাবে বিদ্যুৎ। দরকার হলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে এই মন্দির।

লকা যেন উৎকণ্ঠিত চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল, অই—অই গ দাদাবাবু, আপনার চখ মুখের ভাবটো আমার ভাল ঠেকছে নাই গ। আপুনিকে কিসে ভর করল গ? আই বাবা রুদ্দুরভৈরব! ইথ্যানে আর লয়, চলেন, চলেন দাদাবাবু।

লকা তার শক্ত হাত দিয়ে বিদ্যুতের ডানা ধরে টান দিল। সম্বিৎ ফিরে পেল বিদ্যুৎ। চকিতে অনুভব করল, ভুল হয়েছে তার। ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পেয়ে, নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি সে। তার সারা মুখে, চোখের দৃষ্টিতে, দ্রুত নিঃশ্বাসে উত্তেজনা ফেটে পড়েছে। সে উত্তেজনা এখনও বিদ্যুৎ অনুভব করছে বুকের দ্রুত স্পন্দনে, শিরায় শিরায় রক্তোচ্ছ্বাসে।

কিন্তু উত্তেজনার কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য লকার পক্ষে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিম অন্ধ বাউরিটা রুদ্রভৈরবের এই অলৌকিক অন্ধকারকে ভয় পেয়েছে।

সরে এল বিদ্যুৎ। শান্ত হয়ে উঠল। স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে, মুখোস পরা হাসি হাসল। বলল, না, আমাকে কিছু ভর করেনি লকা। রুদ্রভৈরবের মন্দিরটা দেখে আমি সব ভুলে গেছলাম।

লকা বলে উঠল, হঁ, মানুষ সব ভুলে যায়। ই মাহালিশাটোর কথা ভাবেন ক্যানে। মানুষকে ভুলায়ে লিয়ে যায়। আমি ঠিক বুইলছি দাদাবাবু, ইথ্যানে আর লয়, বার হয়্যা চলেন।

হ্যাঁ, এখন ফিরবে বিদ্যুৎ। জায়গা চেনা হয়ে গেছে। লক্ষ্য-বস্তুর সন্ধান মিলেছে। আশ্বাস পাওয়া গেছে। বোঝা যাচ্ছে, দিনেরবেলায়ও এদিকে লোকের যাতায়াত বড় একটা নেই। হয় তো কাছে পিঠে রাস্তাও নেই বিশেষ। কাল সকাল থেকেই সুযোগের সন্ধান করতে হবে।

আকাশটা কার্তিকের নয়, যেন ভাদ্রের সংশয় ভরা। মেঘ জমেছে। বাতাসও আছে। ডাক শোনা যায় মাঝে মাঝে, কাছে ও দূরে। বিজলী হানা ঝিলিক দিচ্ছে থেকে থেকে। কখনো দু'-এক

ফোঁটা ঝরছে। এখন তাও নেই। প্রতি মুহূর্তে সংশয়। ছ'নৌকোয় পা দেওয়া আকাশের মন না মতি, বোঝা যায় না।

তালবনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, দিনের বেলা এলে দেখা যায় ?

—তা ক্যানে যাবেক নাই। তবে, শ্মশান মশান জায়গা, লোকজন বড় এটটো আসে না।

তাই দরকার। বিদ্যুৎ তাই চায়। লকাকে অনুসরণ করে সে বুঝতে পারছে, বাঁ দিকেই নীচে সেই হাঁটু জল পাহাড়ী নদী জমি নীচে নেমে গেছে। দূরে সেই পচুই চোলাইয়ের আগুন দেখা যাচ্ছে।

বিদ্যুৎতের মনে এল হঠাৎ কথাটা। সে জিজ্ঞেস করল, ওই মেয়েমানুষটি কে লকা ?

—কোন্ মেয়েমানুষ দাদাবাবু ?

—ওই যে তখন ঘরে এসেছিল ?

লকা চুপ। হাঁটতে লাগল। রাস্তা উঁচু নীচু। কিন্তু লকার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আগে আগে অন্ধকারেই চলেছে। চলতে চলতেই বলল, ভেবেছিলুম মেয়্যালোকটোর কথা আপুনি আগে জিগেস করবেন। কিন্তু আপুনি মন্দির দেখতে চাইলেন।

হ্যাঁ, মন্দিরটাই বিদ্যুতের দরকার। মেয়েমানুষটির কথা না জানলেও ক্ষতি নেই তার। তবু বিদ্যুতের কৌতূহল হয় আর সব মানুষের মতো। যদিও একটা আন্দাজ সে করে নিয়েছে।

লকা বলল, উ সোনা।

—সে জানি। ও কে ?

—গাঁয়ের এটটো মেয়্যা। খারাপ মেয়্যা, নষ্ট মেয়েমানু দাদাবাবু।

বিদ্যুৎ আরো পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করল, বেশ্যা ?

যেন দ্বিধায় থতিয়ে গেল লকা। বলল, বেশ্যা ? হুঁ, তা বুইলতে পারেন। সোয়ামী আছে, না থাকবার মতন।...বেশ্যা ? কি জানি দাদাবাবু, সোনাকে কি বুলে আমি জানি না।

একটা সন্দেহ জাগিয়ে রাখতে চায় লকা। তার অবকাশ কোথায় এখানে। স্বামী আছে, সংসার আছে, তবু রাত্রে অন্য-পুরুষের সংসর্গ করে। তাকে আর কি বলে? কিন্তু এখানে এসেছিল কেন? জিজ্ঞেস করার কী আছে? লকার নীরবতাই সব বুঝিয়ে দিচ্ছে। সোনার উপস্থিতিই সব বুঝিয়ে দেয়নি কি? থাক, চুপ করে থাক লকা। বিদ্যুতের আর কোনো কৌতূহল নেই।

কিন্তু লকা নিজেই বলে উঠল, বড়কত্তা আপুনিকে নিজে ডেকে লিয়ে আসলেন উ ঘরটোয়। আপুনি উয়াঁর কুটুম। আমি ক্যানে চুপ কর‍্যা থাকি। কিস্তুক এমন আমি দেখি নাই, বড়কত্তাকে আমি এত বেসামাল আমি অনেকদিন দেখি নাই। ত আমার মনটো আজ বড় জ্বলছে লিভছে দাদাবাবু, খারাপ লাগছে, আমার বুকটো কেমন করছে।

—কেন?

বড়কত্তার ভাবসাব আমার ভাল লাগছে না। দ্যাখেন ক্যানে, ভয়ে সব বেব্‌ভোল হয়্যা যেইছেন।

—কিসের ভয়?

—অই যে বুলছি, বড়কত্তার সাপের পিঠে পা। কখন ছোবল মারে, ই ভয়। বড় তরফের সব যার মুচলেকায় আছে, তুমকার সি মহাজনটো আসবে, নানকুলাল। রাজাসিধিটো অখুন নানকুলালের হাতে, উ-শালো আজা। দুগ্‌গো পূজোর সময় আসছিল, আবার আজ আসবে। উয়ার মনটোয় কী আছে, কেউ জানে না।

তাহলে সেই নানকুলালেরই প্রতীক্ষা ডোমন চক্রবর্তীর। ভয়ে চমকে চমকে ওঠা উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। সাপের গায়ে পা ফেলে সিঁটিয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছেন।

কিন্তু কে নেই? বিদ্যুৎ কি তেমনি নেই! কুড়ি বছর বয়স থেকে নিস্কুণ্ডল ক্লেদাক্ত উত্তোলিত ফণার বেষ্টনীতে সে আছে। সময়ের কোনো নির্দেশ নেই, অথচ প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চিত। কখন, কখন সেই মুহূর্ত আসে। সেই শেষ মুহূর্ত, যার পায়ের শব্দ, আমার আপন

পায়ের শব্দে রেখেছে সচকিত করে, সব সাধ ইচ্ছা ঘুচিয়ে। যার ছায়া, আমার নিজের ছায়ায় মিশে প্রতি পলে পলে অনুসরণ করছে শেষ আঘাতের জন্য।

এবার মুক্তি। সেই পায়ের শব্দ স্তব্ধ করার যুগ-সাধনার মন্ত্র পেয়েছে সে। ছায়া সরাবার কল-কাঠি দিয়েছে তাকে তারই কলকাতা।

লকা বলল, আর কি সাপটোকে পূজা দিতে হয় দাদাবাবু। নানকুলাল ফুর্তি করতে আসবে।

—কিসের ফুর্তি?

—নানকুলালের ফুর্তি দাদাবাবু, মদ আর মেয়্যামানুষ।

—তাই বুঝি সোনাকে ডাকা হয়েছে?

—হঁ, তাই। ই সোনাকে আপুনি বেউশে বুইলবেন কি,কী বুইলবেন, আমি জানি না। কিন্তুক আমি বুইলব, হঁ, আমি বুইলব, উ সোনাটোকে বড়কত্তা লষ্ট করলেন গ দাদাবাবু।

—কেন, তোমার বড় কর্তাই বুঝি—

—হঁ। উই বড়কত্তা পেথম সোনাকে তুল্যে দিলে নানকুলালের হাতে। কিন্তুক, বড়কত্তা কুনদিন সোনার মুখ দ্যাখেন নাই।

বিদ্যুৎ অবাক হল। ঠোঁট উল্টে গেল তার। বলল, মুখ দেখেন নি?

—না। আমি সব জানি গ দাদাবাবু। আপন ঋণটো বাঁচাবার লেগে, ইজ্জৎটো বাঁচাবার লেগে, গিরস্তি মেয়েমানুষটোকে তুল্যে দিলেন নানকুলালের হাতে, ডুমকার লুটিসয়ালা সরকারিবাবুর হাতে।

—সোনা এল কেন?

—ইটো জানি নাই দাদাবাবু। তাই বুলি, ভগমান সব জানেন নাই। ক্যানে? না, ই রাজাসিধির অনেক কত্তার মুখে সোনা ইয়ে কর‍্যা দেয়। কিন্তুক বড় তরফের বড়কত্তার কথা রাখতে গিয়্যা মেয়্যালোকটো লষ্ট হল। ক্যানে, জানি না।

প্রেম? বিদ্যুতের নাকের পাশে অবিশ্বাস আর ঘৃণার রেখা দুটি গভীর হল। ঠোঁট উল্টে হাসল অন্ধকারে।

লকা বলল, লোকে বলে, বড়কত্তার সঙ্গে সোনার আছে। কিছু নাই, আমি জানি। কিন্তুক থাকলে ভাল হত।

—কেন?

—কি জানি! মনটোয় লেয়।

লকার গলার স্বর যেন নামছে। ভাঙতে ভাঙতে নীচে নামছে। বাতাসে কেটে কেটে যাচ্ছে। বলল, সোনার কি এটটো মন নাই গ দাদাবাবু, অঁ্যা? বড়কত্তার জন্যে উ ছিনাল হল, ক্যানে?

বিরক্ত হল বিদ্যুৎ। নিশ্চয়ই লকার গলার স্বর তার মনটাকে বিভ্রান্ত করছে। সোনার মুখটি স্মরণ করে তার বুকের মধ্যে একটি অবিশ্বাস্য ব্যথা টনটন করছে। নইলে, সোনার মুখটা স্মরণ করে যে চিন্তা হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না কেন? যৌন উন্মাদনায় পঙ্কিল আবর্তে গুপ্ত পাপচক্রের একটা ছবি ঠিক যেন ভেসে উঠছে না সোনাকে ঘিরে। সেই ঠাট ঠমক রঙ্গ অঙ্গভঙ্গীর কোনো ছায়া তো ছিল না। সোনার সেই নত মাথা, অস্পষ্ট একটি ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লাগা গাম্ভীর্য এবং ডোমন চক্রবর্তীর দিকে তাকানো তার সেই বিষণ্ণ চোখ মনে পড়ে যাচ্ছে। অভিমান আর অসহায় জিজ্ঞাসাও ছিল যেন সেই চোখে। আর বহুদূরে বেজে ওঠা গম্ভীর মিঠে ঘণ্টার স্তিমিত শব্দের মতো সোনার গলার স্বরেও যেন একটা বিষণ্ণতার সুর ছিল। তবু বিদ্যুতের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের গায়ে বাঁকটা যেন অন্য অর্থ বহন করতে চাইছে। সোনা শুধু ঋণ শোধের শুল্ক? কেন? ডোমন চক্রবর্তী কি তার ঈশ্বর?

বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, কেমন করে জানলে সোনা আর বড়কর্তার মধ্যে কিছু নেই?

লকা বলল, দাদাবাবু, আপুনি আপনকার কুটুমকে চিনেন নাই। আমি চিনি। আমার আর বড়কত্তার জনম এক সাথে, এক মাসে, কেবল দিনের ফারাক। কিন্তুক আমি বাউরি, আর সে বাউন। আমি

পেজা, সে আজা। ই রাজাসিধিতে এক সাথে বড় হইচি। ত দাদাবাবু, রুদ্দুরে যেন আমাকে মাপ করেন, এক সাথে আমরা মাঠে ঘাটে খেলা খেলেছি। বড় দুরন্ত ছিল বটে কি! তখন উঁয়াকে আমি ডুমন ঠাকুর বলে ডাকতম। তুমি করে বলতম। ত, উঁয়াকে আমি চিনি নাই? ছ'সলে মহকুমা শহরে যেয়েই ছিল লেখা পড়া করতে। আর কুনদিন রাজাসিধির বাইরে যায় নাই। ঘরের বড় ব্যাটা, উঁয়ার কত দায় দায়িত্ব। ত উঁয়াকে আমি চিনি নাই?....অখুন বড়কত্তা বুলে ডাকি। ক্যানে কি, সে আমাদিগের আজা। উঁয়ার মনটো আজা-র মতন। যারা শহরকে যায় নাই কাজ কামের ফিকিরে, তাদের দেখলম, ইয়াকেও দেখলম। কুন বাউরি বিটি বউয়ের সঙ্গে শুতে দেখি নাই। ত দাদাবাবু, মিছা বুইলব না। আমি বাউরির ব্যাটা, আমি বুইলছি, বড়কত্তা, উ ডুমন ঠাকুর যদিন ই গাঁয়ের কুন বাউরি ঝি বউকে একদিন চখের ইশারা করত, ত তাতেই কাজ হত। ভাতের জন্য লয়। যি পুরুষকে দেখলে মেয়্যামানুষের হৃদে অসের বাণ ডেক্যা যায়, উ সি পুরুষ। ত সুমুখে দাঁড়িয়ে কুন মাগী আজ ইস্তক উঁয়ার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায় না। আপুনিকে আমি আর কী বুইলব গ দাদাবাবু।···কিন্তুক ত্থাখেন গা, ই রাজাসিধিতে ঠগ্-বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবেক গা। বাউরি মেয়্যাদের মাস্-রস খেয়্যা পিয়া সব ঢোল হয়্যা যেইছে। ভাত, ভাত গ দাদাবাবু, অখুন ভাতের জন্যে, আগে ছিল জামিনদারির রোয়াব। কিন্তুক আমার বড়কত্তাকে সি দোষটো কেউ দিতে পারবেক নাই।···না না উদিকে লয় দাদাবাবু, উ রাস্তাটা বাজবাহিনীর মাঠে গেল্‌ছে।

বিদ্যুৎ থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তা পরিবর্তন করল। তার সংবিৎ নেই। মন জেঁকে বসে আছেন যেন ডোমন চক্রবর্তী। ডোমনের মুখটি তার চোখের সামনে ভাসছে এবং অবিশ্বাস করতে পারছে না লোকাকে। অথচ সোনাকে যখন সে তাকাতে দেখেছিল, তখন মনে হয়েছিল, দুজনের মধ্যে কী একটা সম্পর্ক যেন আছে। ধরা ছোঁয়ার মতো নয়,

তার বাইরে। অথচ দুজনে যেন অলিখিত অকথিত কী একটা চুক্তিতে আবদ্ধ। এবং দেহ আর অবৈধ ভোগের গূঢ় ছায়ায় তা যেন ঢাকা নয়। তবে কী?

বিদ্যুৎ বলল, তবে কী?

—শাঁপ?

—শাঁপ।

—হ্যাঁ, শাঁপ গ দাদাবাবু। ই দুজনকার মাঝখানটোয় ভগমানের শাঁপ আছে। সোনা ত্যাবড়া বাউরির বউ বটে, কিন্তুক উ আমার বুইন। আমার সাক্কেত মাসীর বিটি। উয়াকে আমি চিনি। ই রাজাসিধির কতজনা কত কি দিতে চাইল, জমিন, ঘর, সোনা, দানা। সোনা লিলে না। ত কি বুইলব, ত্যাবড়া ইস্তক আপন বউটোকে খোঁচা দিয়েছে, ত্যাবডার মা, সোনার শাউড়ি মাগী বাবুদিগের পয়সা খেয়্যা, লাগর ধরে্য দিয়া আসছে ঘরকে। সোনা রাজী হয় নাই। ক্যানে? না, বড়কত্তা। উই বড়কত্তা যার মন জুড়ে বসে আছে, তার কাছকে কেউ আগুতে পারে না। ত আমি বুইলছি, 'আই দ্যাখ সোনা, ই গোটা রাজাসিধির মেয়েথেকোরা তোর জন্যে পাগল, তুর রা নাই ক্যানে?' জবাব দিলে, 'অই গ দাদা, ই কথাটো তুমি আমাকে বুইললে? ত শোন, আমি যে পাগল হয়্যা ফিরছি আর একজনের জন্যে।'

'—তাঁকে তু কুনদিন পাবি নাই সোনা।' আমার কথা শুনে সোনা বুইললে, হুঁ, শুতে পাব নাই দাদা। না পাই, না পাই। বড়কত্তার শরীলটো দ্যাখ নাই? অমন শরীলটো সোনা ছোঁবে নাই। ছুঁতে পারব নাই। উ শরীলটোতে পাপ নাই। উ শরীলটো মনটো মেয়ে মেগো লয়। ত উয়ার সাথে আমি মাল খেয়্যা মাঠ বাঁদাড়ে যেয়ে পড়ে থাকব না। কিন্তুক উঁয়ার মনটো পেয়েছি, হুকুম পেয়েছি—।

লকা এক মুহূর্ত থেমে যেন পথের দিশা ঠিক করল। আবার বলল, 'হুকুম। আমি বুলছি, তো দ্যাখ সোনা, বড়কত্তার হুকুমে খারাপ হয়েছে, তু লষ্ট হইছিস।' সোনা বুইললে, 'দাদা বড়কত্তার হুকুম

তো হুকুম। উতে ভাল হওয়া নষ্ট হওয়ার বিচার আমার নাই। শমনের ঘরকে যেতে বুইললে তাই যাব। তবে, হুঁ, কি আমি মেয়্যামানুষ, আমার তো একটো মন আছে। মহাজনের কাছকে যাবার জন্যে বড়কত্তা যে বছর পেথম তুমাকে দিয়ে বুইললে, বিশ্বাস হয় নাই। নিজের কানে শুনব বলে সামনে যেয়্যা দাঁড়ালম। ত, কত্তা মাটি থিক্যা মুখ তুললে না। চোখ তুললে না। যেন কত দোষে ঘাটে সিঁটকে রইছে। দেখে আবার পানটো ফেটে গেল। আ! বড়কত্তা একটা বাউরি বউয়ের কাছকে মাথা তুলতে লারছে। অনেকক্ষণ পরে যেন চুপিচুপি খালি বুইললে, 'হুঁ, লকাকে আমি বুইলছি সোনা, আমি বুইলছি।'....ত দাদা, আমি মেয়্যামানুষ, উঁয়ার হুকুম আমার মাথায় রইল, কিন্তুক আমি মেয়্যামানুষ আমার মনটো পুড়তে লাগল। ক্যানে কি, ভাবলাম, অই গ দেব্তা, তুমার হুকুমে সব দিব, তুমি আমাকে ক্যানে লিলে নাই। তুমি পরকে দিলে, নিজে লিলে নাই, ত দাদা, বড়কত্তা যেন ভগমানের মতো অন্তরযামীন। আমার মনের কথা যেন টের পেয়্যা বুইললে, 'সোনা আমার ই পাপটো তু ক্ষমা করে দিস।'....দাদা, আমি কথা বুলতে লারলাম। বড়কত্তা আবার বুই ললে, 'আরো অনেক ঝি বউ রইচে, উঁয়াদের আমি ভুলতে লারব সোনা। ক্যানে কি, উঁয়ারা কেউ আমার আপন লয় যা আমার নিজের লয়, তা আমি পরকে দিব কেমন করে।' আঃ! আঃ! দাদা আমার চখ ফেটে জল এল গ। দুঃখে লয়, খুশিতে। আমার কি ভাগ্যি, আমি উঁয়ার আপন বস্তু, তাই বড়কত্তা আমাকে বুইললে, আমাকে দিলে। ইটো মানুষের ধরম, কি আপন ধন পরকে দেয়, পরের ধনে পোদ্দারি করে না! ত, পাছে আমার চোখের জল দেখ্যা বড়কত্তা যদিন ভাবে কি আমি লারাজ হইচি, তাই ঘাড় কাত কর‍্যা পলায়ে এলম। কিন্তু যাই কুথাকে? টুকুস ডাক পেড়ে কাঁদবার লেগে পাণটো যে বড় আতুরি পাতুরি করছিল। ঘরে বসে কাঁদবার যো নাই, তুমার বুনাই ধর‍্যা পিটবে, শাউড়ি মারবে, যাই কুথাকে। সি জঙ্গলের দিকে, কাঁদরের ধারে পা ছড়িয়ে বসে পাণ

ভয়ে কাঁদলম। মিছা বুলব না দাদা, ই যাবত তুমার বুনাই ছাড়া কুন পুরুষের সহবাস করি নাই। আমার মনটো কেমন করতে লাগল। বুকটো পুড়তে লাগল। আ! আমার শাউড়ি ভাতার রাজাসিধির কত বাবু বাউনকে ঘরে লিয়ে আসছে। আমি লাগিনীর মতন ফোঁস কর‍্যা উঠছি। অই গ, আমি আন সঙ্গ করব কেমন কর‍্যা! হেই ভগমান, যে পুরুষের মুখ চেয়ে আমার জীবন কেটে গেল, সে আমার হাতের অস খেল, আমার পাণের অস চাইলে না।....

বিদ্যুৎ কথাটা বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, অস কি?

লকা বলল, অস গ দাদাবাবু, অস। তালের অস, খেজুরের অস হয় না? তেমনি।

রস, রসের কথা বলছে। কিন্তু সোনার হাতের রস আর প্রাণের রস মানে কী! বলল, হাতের রস মানে?

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। মেঘ বোধহয় আরও জমাট বেঁধে উঠেছে। কথা বলতে বলতে লকার গতি মন্থর। তাকেই গা ঘেঁষে অনুসরণ করতে গিয়ে বিদ্যুৎও আস্তে আস্তে চলেছে।

লকা প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। বলল, ত আর বুলছি কি গ দাদাবাবু। বড়কত্তা আর সোনার মনের কথা ভগমানে জানে না, ভূত পেরেতে জানে না। বড়কত্তা যখন থিক্যা পেথম মাল খাওয়া ধরলে তখন থিক্যা সোনার হাতের চোলাই ছাড়া আজ ইস্তক খায় নাই। উই পচ্চিমের বড় লদীর ধারে সাত বিঘা জমিন শুঁড়ির নামে বন্নবস্ত দেয়া আছে, তার মানে সোনার নামে বন্নবস্ত দেয়া আছে। আমি ত জানি। ক্যানে কি, উ বিষয়ে বড়কত্তার আমার সাথেই হাতে খড়ি, আর পেথম হাতে খড়ি সোনার হাতের চোলাই মাল দিয়ে। ত কি বুলব দাদাবাবু, তখন একরত্তি মেয়্যা সোনা, কিন্তুক ছুঁড়ি অসটি ভাল বানাত। বাপ কা বিটি যে। উঁয়ার বাপ যে নামকরা শুঁড়ি ছেল। ত লাগার চল্যো আসছে তেমনি। নিত্যি তিরিশ দিন, উই পূজা দালানের পিছনকার ঘরে, মাপা আধসের চোলাই মদ স্যোনা নিজের হাতে রেখে যায়। তা সি বান বাদল যাই হোক, অসের ভাঁড়টি ঠিক

থাকবেক। ই রাজাসিধির কত মানুষ সোনার হাতের অস খেতে চায়, পায় না। তাই সোনা বুইললে, 'সে আমার হাতের অস খেল, আমার পাণের অস চাইলে না।' সোনা বুইললে আর কাঁদলে। আবার বুইললে, 'অ! যদিন মনে করতে পারতম কি আমাকে বড়কত্তা ঘেন্না করে ত সব বুকে চুকে যেত। কিন্তুক ই পাপ মুখে মিছা বুইলতে লারব। অাঁতে যদিন না টান থাকবেক ত চখ দেখ্যা টের পাব না? ত দাদা, ইটো বুঝলম কি, মনের জিনিসে ভগমান ভাগ বসায়। সবটুকুন উনি কাউকে দেন না। ত সি মহাভারতে আছে না এটটো মুনি ঋষির কথা, আর এটটো আজার মেয়ের কথা? অই গ, সি যযাতি আজার মেয়্যা, কি নাম তার। মাধবী, হঁ মাধবী। মুনিটোর নাম আমার মনে নাই। ত সি কথাগুলন আমার মনে পড়ল। মুনিটোর গুরু বুইললে, গুরুদক্ষিণা বাবদ ওঁয়াকে আটশ ঘোড়া দিতে লাগবে। যেমন তেমন ঘোড়া লয়। সি ঘোড়ার রং হবে চাঁদের মতন, এটটো কান হবে লীল। ত গরীব মুনি, উ সব কুথাকে পাবে? আজা পেজার দোরে দোরে ঘুরতে লাগলে। ঘুরতে ঘুরতে গেল যযাতি আজার কাছে। আজা বুইললে, 'আমার ঘোড়া নাই ঠাকুর, তুমি আমার মেয়্যা মাধবীকে লিয়ে যাও ক্যানে? আমার মেয়্যাকে তুমি লাও, লিয়ে যাদিগের কাছকে চাঁদের মতন ঘোড়া আছে, তাদিগের কাছকে যাও। আমার মেয়্যাকে পেলে উয়ারা তুমাকে ঘোড়া দিবে।' ত মুনিটো তাই করলো। যোবতী মেয়্যা মাধবীকে লিলে, লিয়ে, এটটো ঘোড়াওলা আজার কাছকে গেল। সি আজাটোর ছেল চাঁদের মতন দুশ ঘোড়া। বুইললে, 'ঘোড়াগুলন দিতে পারি, কিন্তুক উ মেয়্যাটোকে আমার সাথে সহবাস করতে হবে। উয়ার পেটে আমি এটটো ছেল্যা করব।'

'মেয়্যাটো বুইললে, আমি রাজী আছি, উতে আমার কুন দোষ লাগবেক নাই।'

'ত আজার সহবাসে মেয়্যাটোর এটটো ছেল্যা হল। দু'শ ঘোড়া পেল মুনি। আরও ছ'শ চাই।....ত গেল আর এটটো আজার

কাছকে। সেও উ কথাই বুইললে। মেয়েটো তার কাছে রইল, এটটো ছেল্যা হল। মুনি আর তুশো ঘোড়া পেল। তা'পরেতে গেল আর এটটো আজার কাছকে। তার কাছকেও চাঁদের মতন ঘোড়া রয়েছে। সেও মেয়্যাটোকে চাইলে এটটো ছ্যেলা করবার জন্যে। মেয়্যাটো তার কাছকে গেল, ছেল্যা হল। মুনি তুশ ঘোড়া পেল।

ত মেয়্যাটোকে পরপুরুষের কাছকে দিয়ে মুনি চাঁদের মতন ছশ ঘোড়া পেল। আর তুশ কুথাকে পাবে? ক্যানে কি চাঁদের মতন ঘোড়া যে আর ভোমণ্ডলে নাই।

তখন মুনিটো তার গুরুর কাছকে ফিরে গেল। চাঁদের মতন ছশ ঘোড়া দিল। দিয়া বুইললে, গুরুদেব এমন ঘোডা আর সারা পিথিমিতে কুথাকে নাই। ত ই মেয়্যাটোকে নিয়ে তিন আজা আমাকে ছশ ঘোড়া দিইচে। বাকী তুশ ঘোড়ার জন্যে ইয়ার পেটে আপুনি এটটো ছেল্যা করুন। আমার গুরুদক্ষিণা মিটুক।

তখন গুরুমশাই তাই করলে। এটটো ছেল্যা হল। তারপর মুনি মেয়্যাটোকে লিয়ে উঁয়ার বাপের কাছকে ফিরে দিয়্যা এল। বুইললে, 'আজামশাই আমার গুরুদক্ষিণা দেয়া হয়েছে।'

লকা থামল। এই প্রাচীন অন্ধকার প্রান্তরে, লকার গলা যেন আদিম যুগের এক রূপকথার স্বপ্নে ডুবে গিয়েছিল। বহু দূর অদৃশ্য কোন লোক থেকে একটা অমানুষিক সুরে ভেসে আসছিল তার গলা। আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যেও বিদ্যুতের ঠোঁটের কোণ বেঁকে উঠছিল। বিদ্রূপে গভীর হয়ে উঠছিল নাকের পাশের রেখা দুটি। মনে পড়ছিল পাগল মুনির কাহিনী। বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্যে, যযাতি কন্যা মাধবীকে শুল্ক হিসাবে ব্যবহারের, সেই উদ্‌যোগ পর্বের গল্প। কোথায় গালব-মাধবী, আর কোথায় সাঁওতাল পরগণার গ্রামের ভোমন চক্রবর্তী আর জ্যাবড়া বাউরির বউ সোনা গুণিনী।

ভাবছিল বিদ্যুৎ। বিদ্রূপে এবং প্রেমে, অন্ধকারে বিকৃত ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল তার মুখ। তবু সোনার মুখটা মনে পড়লেই তার মনের

মধ্যে যেন একটা উল্টো স্রোত বইছিল। কালো মুখে সেই অপলক শান্ত গভীর আয়ত দুটি চোখ। বহু অজানিত কথা যে চোখের দুয়ারে এসে স্তব্ধতায় থমকে রয়েছে। আর, অনেক রেখা আঁকা রক্তিম সোনার রং মুখ ডোমন চক্রবর্তীর। সেই মুখটিও যেন তার বিদ্রূপকে ধনুকের টংকারে নিষ্ঠুর তীর হানতে বাধা দিচ্ছিল। লকার দৃঢ় বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করা যায় না যেন!

লকা কথা থামিয়ে দাঁড়াল। নাক তুলে যেন গন্ধ শুঁকল চারদিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বলল, আই দ্যাখ ক্যানে, শালোর রাস্তাটো আবার ভুল হয়্যা যেইছে। ই রাজাসিধির আঁধারে যেন কী আছে, পথ ভুলায়ে লিয়ে যায়। আসেন, আসেন গ দাদাবাবু, নীচের দিকে লেমে, ডাইনে যেতে লাগবে।

বলতে বলতে লকা নীচের দিকে নেমে গেল। বিদ্যুৎ অনুসরণ করল। সমতলে নেমে বলল, সোনা তাহলে তোমাদের বড়কত্তার প্রেমের মাশুল?

—প্যামের মাশুল?

লকা যেন অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বলল, তা বুইলতে লারব দাদাবাবু। উয়ারা দুটোতে কার কী, আমি জানি নাই। মাহাভারতের কথা বুলে সোনা কাঁদলে। কাঁদলে, আর বুইললে, 'দাদা, তা সি মেয়্যাটোর বাপ, দেশের তাবত আজাদের ডেক্যা, মেয়্যাকে স্বয়ামবর হতে বুইললে, মেয়্যার বিয়া দিতে চাইলে। মেয়্যা বুইললে, অই গ বাপ, আমি আর বিয়া করব নাই। বনবাসে যেয়ে, ভগমানের নাম করব।··আ! মন বুলে কি কিছু নাই গ যে, মেয়্যাটা আবার বিয়া করবে? যার গুরুদক্ষিণার জন্য সব দিইচে, তার ধম্মো থিক্যা উ মেয়্যাকে কি তফাৎ করা যায়?....ত দাদা, আমার মনটোয় পাপ, তাই কাঁদি। কিন্তুক মাহাভারতের সি কথাগুলন আমার মনে পড়ল। ভাবলম কি, সিটো আমার মনের ধম্মো, বড়কত্তা আমাকে যার কাছকে যেতে বুলবে, আমি তার কাছকে যাব।' ···সোনা বুইললে, আর কাঁদলে। ত দ্যাখেন ক্যানে দাদাবাবু,

সি যুগটো নাই, সি কালটো নাই, তুমাদিগের ই কি কাণ্ড বাপু? কী বুইলব? উয়াদের কথা আমি বুঝতে পারি নাই, আপনাকে কী বুইলব দাদাবাবু।—আই, ইবারে বাঁদিকে চলেন। এসে পড়ছি।

বিদ্যুৎ দেখল, সেই গলিটার মোড, গ্রামে প্রথম এসে চাঁদু গাড়োয়ান তাকে যে পথটা দেখিয়ে গিয়েছিল। লকার পিছনে পিছনে ঢুকল সে। তার সমগ্র চেতনা জুড়ে বসেছে সোনা আর ডোমন চক্রবর্তী। কিন্তু এসব কেন ভাবছে বিদ্যুৎ। এসব ভাবার দিন অনেক পাওয়া যাবে। আজ নয়। হয় তো ডোমন চক্রবর্তী তাঁর বল এবং ছল হারিয়েছেন। কৌশল হারাননি। ন্যায় অন্যায় সুখ দুঃখ ভাববার অবসর কোথায়। মীনাক্ষীর কথা মনে পড়ল তার।

ঠাকুরদালানে ইতিমধ্যে ভিড় বেড়েছে। হ্যাজাক জ্বলছে একটি। দুজন লোক শাবল নিয়ে মাটি খুঁড়ছে ঠাকুরদালানের দু' পাশে। বাঁশ এবং বিচুলির বেড়া আনা হয়েছে। আকাশকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, তাই আরো আড়াল করার আয়োজন। সাঁওতালরা আরো এসেছে। বাঁশীর সুরে দুটি মেয়ে গুন্‌গুন্ করছে। কথা বোঝা যায় না। গলা চেপে কিন্তু উঁচু সুরে গাইছে মেয়ে দুটি চোখ নামিয়ে। ওদের লজ্জা করছে। তাই ওদের চোখ নত, কিন্তু ঠোঁটের কোণে শ্রোতা এবং দর্শক-সচেতন হাসি। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে গান করছে। কিন্তু পুরুষগুলি বলির পশুর মতোই যেন নির্বিকারভাবে চুপচাপ। কয়েকজন সমবয়স্কা ছাড়া অন্যান্য মেয়েরাও তাই। কিন্তু বলির পশুগুলিকে ওরা একসঙ্গে রাখেনি। যে-যার নিজের বুকের কাছে ধরে রেখেছে।

প্রতিমার দিকে ফিরল বিদ্যুৎ। লকাটা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। এমন সময় রামেশ্বর এসে প্রায় ঝাপিয়ে পড়লেন বিদ্যুতের ওপরে। —এ্যাই, এ্যাই যে। কুথা গেলছিলে বাবা। তুমাকে খুঁজ্যে ফিরছি। চল চল, যা হোক্ দুটো খেয়্যা লিবে। পুজোর সময় হয়্যা আসলো।

রামেশ্বর অবসর দিলেন না একটু। প্রায় টানতে টানতে নিয়ে

চলে গেলেন ভিতরে। এখন আর বিদ্যুৎকে ছুঁতে ওর কোনো বাধা নেই। পূজোর সামগ্রী সাজাবার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

খেতে বসাই হয়েছে, খাওয়া হয়নি বিদ্যুতের। খেতে পারেনি সে। অপরিচিত একরাশ লোকের সঙ্গে খেতে দিয়েছিলেন মেজবউ। তারা কারা, বিদ্যুৎ জানে না। জানে শুধু ললিতার বরকে। বাড়ির জামাইকেও আলাদা করে খাওয়াবার সময় নেই আজ। বেচারি! নত মুখে খাবার নাড়াচাড়া করছে শুধু। মুখটা যেন ঘামছে, লাল দেখাচ্ছে। হয়তো দু' এক পাত্র ললিতা নিজের হাতেই খাইয়ে দিয়েছে। একটি খুশিচঞ্চল পশু খাঁচায় বাঁধা পড়েছে। মেজবউকে সাহায্য করছিল আভা। কিন্তু কী ভেবেছে আভা। কলকাতার ছেলে কি কোনোদিন দেখেনি মেয়েটি? চোখ সরছিল না কেন আভার? না তাকিয়েও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিল বিদ্যুৎ, সেই দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু, বিপজ্জনক।

মেজবউ বলেছিলেন, আভা, জামাইকে বিদ্যুৎকে আর ললিতার ভাসুরকে পচির ঘরে শুতে দে, বিছানাটাকে ঠিকঠাক কর‍্যা দিয়া আসিস।

সেই সময় একবার চোখ তুলেছিল বিদ্যুৎ, আভা তাকিয়েছিল। কিন্তু শোবার জন্যে বিদ্যুৎ আসেনি এখানে পশ্চিমের ওই ঘরের চেয়েও কলকাতার অনেক খারাপ জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে তাকে। তবু তখন থেকেই ভাবতে খারাপ লাগছিল, ওই ঘরটিতে অপরিচিত দুটি লোকের সঙ্গে তাকে শুতে হবে। কিন্তু ললিতা? ললিতা কি তার বরকে ও-ঘরে রাত কাটাতে দেবে।

খাওয়ার পরে লোকগুলি যে কে কোথায় অদৃশ্য হল, ভেবে পেল না বিদ্যুৎ। সবটাই যেন কেমন রহস্যময়। সে কোথায় আঁচাতে যাবে ভাববার আগেই আভাকে সামনে দেখতে পেল সে। আভার হাতে একটি বাতি। বলল, সেইখানেই চলুন, পশ্চিমের ঘরের ওই পেছনে। সবাই পুকুরে চলে গেছে।

বিনাবাক্যে বিদ্যুৎ অনুসরণ করল আভাকে। এবার আভা জলের ঘটি হাতে তুলে নিল। জল ঢেলে দিতে দিতে বলল, কিছুই তো খেলেন না আপনি।

বিদ্যুৎ শান্তভাবেই জবাব দিল, খেয়েছি তো।

বিদ্যুৎ জানে, তার মুখভাব লক্ষ্য করছে আভা। বলল, আপনি খুব কম খান।

হয় তো। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ বা লজ্জা প্রকাশ করতে পারবে না বিদ্যুৎ। সে চুপ করে হাত ধুয়ে নিল। অনুসরণ করল আভাকে।

পশ্চিমের সেই ঘর। ভয়ে এবং বিতৃষ্ণায় বিদ্যুৎ তাকাল বিছানার দিকে। কে জানে, এর মধ্যেই ললিতার ভাসুর এসে শুয়ে পড়েছে কি না। কিন্তু দেখা গেল বড তক্তপোশটা তেমনি শূন্য। বিছানা তেমনি এলোমেলো।

আভা গামছা দিল। ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলল, পান নিয়ে আসি।

আশ্চর্য। সবাই কাউকে না কাউকে নিয়ে ব্যস্ত। হয় তো মেজবউ বিদ্যুৎতের আতিথেয়তার দায়িত্ব আভাকেই দিয়েছেন। কিন্তু আভা কি শুধু দায়িত্ব পালন করছে? বিদ্যুৎতের তা মনে হচ্ছে না কেন? গ্রামের মেয়েদের চেনে না বিদ্যুৎ। একটা কল্পনা আছে মাত্র। কিন্তু তার সঙ্গে আভা মিলছে না। আভাকে এবং এ বাড়িকে আরো রক্ষণশীল মনে করেছিল সে।

আভা এল পান নিয়ে। পান দিয়ে তক্তপোশের উপর উঠল। বিছানা পাততে আরম্ভ করল। বিদ্যুৎ এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

—কোথায় যাচ্ছেন?

যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আভা। বিদ্যুৎ থেমে বলল, বাইরে।

আভার বিছানা পাতা থেমে গেল। নেমে এল তক্তপোশ থেকে। বলল, অপনি এখন শোবেন না?

—না তো। আমি এখন বাইরে যাব।

বিদ্যুৎ তাকাল আভার দিকে। আভা তেমনি তাকিয়ে আছে। বিস্ময় আছে কি ওর চোখে? তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে ওর চোখ। কী দেখছে মেয়েটা? বিদ্যুৎ বলল, কিছু বলছিলে?

—মাসীমা আপনাকে শুয়ে পড়তে বলছিল।

আমি কখনো কালীপুজো দেখিনি, তাই দেখব।

আসলে বিদ্যুৎ কোনরকমেই আজকের রাত ঘুমোতে পারবে না। আবার চোখাচোখি হল। আভা চোখ নামাল। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাকাল। যেন কোনো দ্বিধা কাটিয়ে নিল। বলল, আমি মনে করেছি, আপনার শরীর আর মন দুই-ই খারাপ। রাত্রি জাগলে—

তার আগেই বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, কেন, এরকম মনে হল কেন?

বিদ্যুৎ অস্বস্তিবোধ করছে। আভা যেন কেমন বিব্রত হয়ে উঠল। বলল, আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল।

আভা যদি চতুরালি না করে থাকে, সংসারের আর দশটি সাধারণ মেয়ের অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখে থাকে, তবে হয়তো ঠিকই বলেছে। মানুষের ভিতরের চিন্তা তার সারা গায়ে, সারা মুখে ছায়া ফেলে। কিন্তু সব সাধারণ মেয়ের চোখে পড়ে না। এ বাড়িতে আর কারুর চোখে তা পড়েনি। আর শুধু শরীর নয়, মনের কথা বলছে কেন আভা? তার মনের কথা আভা কি জানে? তাকে আভা চেনে না, তাই আভা নির্ভয়।

বিদ্যুৎ আভার গায়ের দিকে তাকাল। জন্মের ঐতিহ্যে কিংবা পরের বাড়িতে খেটে খেয়েও আভার স্বাস্থ্য অনম্র। এই সাঁওতাল পরগণার পাথর রুক্ষ ভূমিতে, শক্ত দীর্ঘ সুঠাম পলাশ গাছের মতো। মীনাক্ষীকে যে অনম্রতা এখনই সাজাতে হয়। স্বাস্থ্যকে বন্য তৈরী করতে হয়। কিন্তু চিনু মণ্ডলের সঙ্গে মেলাতে পারছে না আভাকে। সে আর এক জাতের মেয়ে। মীনাক্ষী. আভা, হয়তো বাউরি মেয়ে সোনারও একটা জাতের মিল আছে কোথায়।

আভা সঙ্কুচিত হল কি না বোঝা গেল না। আঁচলটা টেনে দিল

গায়ের। সরে গেল না। শুধু চোখ নামাল। বিদ্যুৎ বলল, আমার শরীর ভালই আছে। তুমি বিছানা পাতলে না?

—আপনি না শুলে পাতার দরকার নেই। ললিতার বর শোবে না। ললিতা তার বন্ধুদের নিয়ে বরের সঙ্গে কোথায় নাকি রাত জাগবে। ওর ভাসুরও অন্য কোথাও রাত কাটাবে।

—কোথায়?

—তা জানি না। বোধহয় পাঁচু বাউরিদের সঙ্গে।

—পাঁচু বাউরির সঙ্গে?

আভা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, আপনি বুঝি ঠাকুরদালানের পেছনে যাবেন?

আপাত পরস্পরহীন মনে হলেও, কোথায় যেন একটি সূত্র রয়েছে আভার কথায়। ঠাকুরদালানের পিছনের কথা সে জিজ্ঞেস করছে কেন? সে কি জানে বিদ্যুৎ ডোমন চক্রবর্তীর ঘরে গিয়েছিল? জিজ্ঞেস করল, কেন?

আভা বলল, পাঁচু বলছিল, আপনি ও-ঘরে ছিলেন।

বিদ্যুৎ বলল, হ্যাঁ।

আভা আবার কিছু বলতে চাইল। কিন্তু এবার নীরব হয়ে গেল। আশ্চর্য, বিদ্যুৎ কেন দাঁড়িয়ে আছে! নিজের ওপর বিরক্ত হল সে। আভাকে এড়িয়ে যেতে পারছে না কেন?

বিদ্যুৎ বলল, যাব না ওখানে।

—ওখানে কেউ যায় না। শুধু উনি থাকেন।

উনি অর্থাৎ ডোমন চক্রবর্তী। বিদ্যুৎ বলল, আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। অদ্ভুত লাগছিল?

ঠিক সেই সময়েই ঢাক বেজে উঠল। যেন একটি তীক্ষ্ণ তীর একটি বিশাল দেহে চকিতে বিঁধল। গভীর বিশাল নিথর অন্ধকার রাত্রিটা যেন কাঁপল, মুচড়ে মুচড়ে উঠল। বিদ্যুতের মনে হল তার শিরদাঁড়ায় পড়ছে ঢাকের শক্ত কাঠিগুলি। সে বাইরের দিকে ফিরে তাকাল। আবার ঘরের দিকে। কিন্তু আভার দিকে নয়। দেয়ালে

ঝোলানো তার ব্যাগটার দিকে। আবার বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আবার আভাকে করুণ মনে হল তার। না বলে সে যেতে পারল না—যাচ্ছি। তুমি পুজো দেখবে না?

নিশ্চয়ই তার গলা শুনতে পেল না আভা। সে যেন অসহায়ভাবে ঘাড় নাড়ল। বিদ্যুৎ বেরিয়ে গেল। সন্দেহ হল। আভা পিছনে পিছনে আসছে। এবার আলো দেখাবার প্রয়োজন ছিল না। হ্যাজাকের নীলচে রেশ এসে পড়েছে গলির মধ্যে। অন্ধকার থেকে আলোকিত ...ঞ্চের মতো দেখাচ্ছে উঠোনটা।

সবাই চেঁচিয়ে কথা বলছে উঠোনে। ঢাকীরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ব জাচ্ছে। পালক কাঁপছে। পূজায় বসেছে পুরোহিত। ঠাকুরদালানের ভিতরে ধোঁয়ায় গেছে ভরে। প্রতিমার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ধোঁয়া দাঁড়াতে পারছে না। বাতাস ঢুকছে দালানের মধ্যে। পশ্চিমের বেড়াটা কাঁপছে বাতাসে। চালচিত্রের ছবিগুলির দিকে তাকাল বিদ্যুৎ। তার দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। কতগুলি ত্রিকোণ যন্ত্র, লতানো পদ্ম আর মানব-শিশুর প্রতীক। মানে কী? প্রতিমার চূড়ার বাংতার ঝলক কি এখনো কালীর চোখে? হ্যাজাকের আলোর দৃষ্টি যেন আরো দীপ্ত তীব্র দেখাচ্ছে।

পিছনে ফিরল বিদ্যুৎ। আভাকে দেখতে পেল না। কিন্তু ওর দৃষ্টি তার গায়ে বিদ্ধ হচ্ছে কেন? আশেপাশে তাকাল সে। কেউ তাকে দেখছে না। তবে? প্রতিমার দিকে তাকাল সে। আবার নর-মুণ্ডগুলি চেনা চেনা লাগছে।

আভা যদি নেই, তবে গায়ে বিঁধছে কেন? আভা জানে না, বিদ্যুৎ কেমন করে ঘুমোবে? এই মন নিয়ে, বাজসিদ্ধির এই রাতে কেমন করে সে একলা একটা ঘরে শুয়ে পড়বে? তার দেহের প্রতিটি কোষ ও অণু তীক্ষ্ণ হয়ে আছে।

কিন্তু এ প্রতিমার সামনেও তার দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তার মনটা টানছে দালানের পিছন দিকে। নানকুলাল এসেছে এখন? সোনা এসেছে? কৌতূহল হয়। কারণ এ রাত্রি নিষ্কর্ম

কাটানো ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। স্বর্গযাত্রা এবং সেই দুর্বোধ প্রতীক চিহ্ন পাথর নিয়ে এ রাত্রেই চলে যাওয়া যাবে না।

সে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল দালানের পিছন দিকে ওখানে কেউ যায় না। শুধু উনি থাকেন। ঢাকের শব্দের মধ্যে কেউ যেন স্পষ্ট গলায় বলল কথাগুলি। তবু জোর করে পা টেনে টেনে বিদ্যুৎ এগিয়ে গেল। অন্ধকার এখানে আরো গাঢ় হয়েছে। কারণ হ্যাজাকের আলো চোখ টেনে রাখে।

এমন সময় একটা পটকা ফাটল দ্ব্যুম্ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলে চীৎকার করে উঠল, সরে যা সরে যা, তুবড়ি জ্বলবে।

বলতে বলতেই আগুনের ফোয়ারা উঁচু হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠাকুরদালানের নীচের প্রাঙ্গণে একরাশ ছেলে মেয়ে জড়ো হয়েছে। জ্বলন্ত তুবড়ির ফোয়ারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। কয়েকজন বড় ছেলেও আছে। তাদের দেখলেই বোঝা যায়, শহরে বাস, ছুটিতে এসেছে।

বিদ্যুৎ পায়ে পায়ে ঠাকুরদালানের সামনে ফিরে এল আবার। আর একটা তুবড়ি জ্বলে উঠল। আগের তুবড়িটা নিভে গেল। রামেশ্বর এলেন প্রাঙ্গণে। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই ওঁকে ঘিরে ধরল। কাপড় টেনে, গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, আমাকে, আমাকে। অই গ, অই জ্যাটা, অই খুড়ো, অই মেসো, আমাকে দাও গ !···

এক একজন এক এক সম্পর্কের নাম ধরে ডাকছে, হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরছে। বিদ্যুৎ দেখল, রামেশ্বরের হাতে কয়েক বাক্স ফুলঝুরি।

রামেশ্বর হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বললেন, আরে র', র' ক্যানে, দিচ্ছি।

বাক্স খুলে তিনি প্রত্যেকের হাতে হাতে কয়েকটা করে ফুলঝুরি ভাগ করে দিলেন। কে যেন একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠের টুকরো রেখে দিয়েছে মাঝখানে। ছোটরা সবাই ছুটে গেল সেখানে। হাতে হাতে

ফুলঝুরি জ্বলে উঠল। দেখলেই বোঝা যায়, সব থেকে সস্তা লালচে ফুলঝুরি সেগুলি।

বড় ছেলেরা পটকা ফাটাচ্ছে। আবার একটা তুবড়ি জ্বলে উঠল। ঢাকীরা বেশ খুশি হয়ে উঠেছে। বাজনার তালে তালে তাদের শরীর দুলছে। পালকের চূড়া কাঁপছে। বিদ্যুৎ দেখল রামেশ্বরও হাতে তুবড়ি দিতে দিতে দুলছেন। এবং মুহূর্তে বুঝতে পারল, রামেশ্বরও মদ খেয়েছেন। তাঁর চোখের ঔজ্জ্বল্যে ঝলক হানছে। চোয়াল ঈষৎ উঁচু বোধ হচ্ছে। ডোমনের সঙ্গে আরো বেশী মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এখন।

রামেশ্বর হাঁক দিলেন, অ্যাই, অ্যাই বষ্ঠিনাথ, আর তুবড়ি কুথা র‍্যা? ই কি ছোট-ছোটগুলন জ্বালছিস! ই কি তুমকার মাল না রামপুরহাটের মাল, আঁ?

কে বষ্ঠিনাথ, ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেল না বিদ্যুৎ। জবাবে একটা চীৎকার শুনল শুধু। বিদ্যুতের খুব কাছেই কে যেন বলে উঠল, দশ টাকা দিইচে, তাতে কি মুনকে তুবড়ি পুড়বে? সেজ্‌মামা আছে বেশ।

আর একজন বলল, মালের ঝোঁকে বুইলছে।

বিদ্যুৎ দেখল, সাঁওতালদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খালি গায়ে নাভির নীচে হাত চাপা দিয়ে, অবাক হয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে। বাবা মায়েদের কোলে বুকে জড়িয়ে রাখা বলির পাঁঠার মতোই ওদের চোখে ভীরু বিস্ময়। ফুলঝুরি হাতে ছেলেমেয়েদের লাফালাফি দেখে মাঝে মাঝে হেসে উঠছে।

আকাশের ওপরে একটা শব্দ হল, দ্যুম্! পরমুহূর্তেই রঙীন আলোর মালা ছড়িয়ে পড়ল। পশ্চিমা বাতাসের ঝাপটায় পূবের দিকে, বেগে ছুটল ঝাড়ের মালা।

—হাবুই! হাবুই!

ঢাকের শব্দে তাল কাটল, স্খলিত শোনাল। ঢাকীরাও আকাশের দিকে মুখ করে দেখছে।

কে যেন চীৎকার করে উঠল, দক্ষিণপাড়ার, ছ'য়ের তরফ।

আর একজন বলে উঠল, দুটো ডাক্তার রইচে বাড়িতে, উয়ারা গোটা বাজসিদ্ধির আকাশে হাউই জ্বালাতে পারে।

আবার শব্দ হল আকাশে। আবার আলোর বন্যা ফিনকি দিয়ে উঠল। মালা হয়ে উড়তে লাগল আর নিভে যেতে লাগল টুপ টাপ করে। বাজসিদ্ধির নিকষ কালো অন্ধকার আকাশের হাউইয়ের রূপ খুলেছে। কলকাতা হলে—।

বিদ্যুতের চোখের সামনে কলকাতা ভেসে উঠল। প্রথমেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোট ছোট ভাই বোনদের মুখগুলি। দেখল ওরা অন্ধকার গলিতে ছুটোছুটি করছে। কে কোথায় বাজি পোড়াচ্ছে তাই দেখবার জন্যে হন্যে হয়ে একবার এদিক, আর একবার ওদিক ছুটছে। বিদ্যুৎ থাকলে তবু চার আনা ছ আনার যাহোক কিছু কিনে দিত। মিথ্যে কথা বলে হয়তো কারুর কাছ থেকে ধার করত একটা টাকা। কিংবা মীনাক্ষীর কাছে থাকলে চেয়ে নিত। নয়তো চিনু মণ্ডল ছিল। যেমন করে হোক একটু কিছু, গোটা কয় ভুঁই চরকি, এক বাক্স ফুলঝুরি, খুবই সামান্য। তবু দিত। দিয়ে আসছে কয়েক বছর। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু, বিদ্যুতের বাবা, কিছু দেবেন না। বরং আজ দেওয়ালীর ছুটিতে সারাদিন বাড়ি থাকতে হয়েছে। তাইতেই অনেকের পিঠে চড় চাপড় পড়েছে। তার ওপর বাজিতে পয়সা পোড়ানো। 'আমি যদি মন্ত্রী হতাম' নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বলছেন রকে বসে, 'তা হলে বাজি পোড়ানো বন্ধ করে দিতাম। বে-আইনী করে দিতাম। যে দেশের লোক খেতে পায় না তাদের আবার এ সব কী?' ...আর মা—এখন রান্নাঘরে, উনুনের ধারে আছেন। রান্না করছেন। মাঝে মাঝে বাইরে আসছেন। কারণ, পাশের তেতলা বাড়ির ছাদে নিশ্চয় প্রতি বছরের মতোই বাজি পোড়ানো হচ্ছে। তার শব্দে এবং ঝলকে মা মাঝে মাঝে বাইরে আসছেন। তাকাচ্ছেন ওপরের দিকে। আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকছেন। এবং কেন জানি না বিদ্যুতের মনে হল, মায়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। আর মায়ের চোখের সামনে হয়তো

বিদ্যুতের মুখখানিই ভেসে উঠছে। বিদ্যুৎ নয়, খোকা। মায়ের অনুচ্চারিত ভাবনাগুলি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বিদ্যুৎ, 'কোথায় গেছে ছেলেটা কে জানে। আজ অন্ধকার দিন। তা কপালে যার—।'

কপাল! মীনাক্ষীর কথা মনে পড়ল, 'আমাদের কপাল বলে কিছু নেই। সবটাই ফোরহেড।' এবং এখন মীনাক্ষী কোথায়? সত্যি কি ওর কোনো বড়লোক ছেলে বন্ধুকে সঙ্গ দিচ্ছে? যাকে বলে এন্টারটেন করা! সেই রকম চোখে চোখ রেখে, ঠোঁটের কোণে ছলনা করে আর টেবিলের ওপরে বুকটাকে এক আশ্চর্য চাতুর্যে ঠেলে দিয়ে! 'কী করব বল, তোমরা এভাবে ঠকতে ভালবাস, তাই ঠকাতে শিখি।' মীনাক্ষী বলে, আর বিদ্যুতের সামনেই অনেক ছেলের সঙ্গে অনেক ছলায় কলাবতী হতে দেখেছে ওকে। আর বিদ্যুতের কাছে যখন একলা হয়, তখন মীনাক্ষীর সারা শরীরের ঔদ্ধত্য যায় জুড়িয়ে। ক্লান্তির গ্রাসে যায় ডুবে। হাসিটা হয়ে ওঠে বিষণ্ণ। শুধু চোখের ভিতর দিয়ে জেগে থাকে একটি অসহায়, আশাস্পন্দিত প্রাণ। আজ এই দেওয়ালীর রাত্রে, এখন হয়তো ও কারুর সঙ্গে প্রেমের ভান করছে, আর হয়তো, কল্পনার চোখে ভাববার চেষ্টা করছে বাজসিদ্ধি গ্রামের চেহারা। সেই গ্রামের অন্ধকারে একজন লোহার হাত-খোন্তা আর অ্যাসিডের শিশি নিয়ে ঘুরছে, এমনি একটা ছবি হয়তো মিনুর মনে ভাসছে। সে ফিরে যাবে কলকাতায়। সার্থক হয়ে ফিরে যাবে, তারপর—।

চোখের সামনে তুবড়ির ফোয়ারার ওপারে, দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে সংবিৎ ফিরল বিদ্যুতের। আভা। আরো দুটি অচেনা মেয়ে। ওরই সমবয়সী, পাশে দাঁড়িয়ে, হাসছে। কলকল করছে তুবড়ির ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আভার চোখ বিদ্যুতের ওপর। আশ্চর্য! একে কী বলে! কৌতূহল না গোয়েন্দাবৃত্তি? ভাল-লাগা, না একটা অভ্যাস মাত্র?

হঠাৎ ঢাকের শব্দ থেমে গেল। তখনই বোঝা গেল ঢাক বাজছিল। কারণ এক মুহূর্তে সব শূন্য বোধ হল। আর একটা বলির পশু, যেন

জিজ্ঞাসু গলায় ডেকে উঠল, 'এ সব কী হচ্ছে? মানুষেরা! আমাদের তোমরা এখানে আটকে রেখেছ কেন? আমাদের ভয় করছে।'

তুবড়ি নিভে গেল। আভা মেয়ে দুটির সঙ্গে ঠাকুরদালানের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল। তাতে, বিদ্যুতের আরো নিকটবর্তী হল ওরা। মেয়ে দুটির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু আভা যেন না তাকিয়েও দেখছে বিদ্যুৎকে। অন্য মেয়ে দুটি, সিঁড়ির সামনে বড় ছেলেদের সঙ্গে যেন কী কথা বলছে, যেন কিছু পরামর্শ করছে, আর হাসাহাসি করছে।

একটি ছেলে ডাকল, এই আভা, শোন।

—না।

ছেলেটি স্বাস্থ্যবান, লম্বা চওড়া, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চকিতে একবার লক্ষ্য করে দেখল রামেশ্বরের দিকে। রামেশ্বর তখন একজন সাঁওতাল মাতাল পুরুষের সঙ্গে কথা বলছেন। ছেলেটি হঠাৎ আভার কাঁধের ওপর থাবা বসিয়ে টানল। এবং বিদ্যুৎ অবাক হয়ে দেখল, আভা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, ভাগ। গিলে মরেছিস বুঝি?

বলে হেসে উঠল। ছেলেটি হেসে বলল, মাইরি, না।

—তবে? ছোটলোকের মতো করছিস কেন?

—তোর দেখছি গ্যাদা ঘোচে না।

বোঝা গেল ছেলেটি শহরে থাকে। ছুটিতে দেশে এসেছে। কথার উচ্চারণ শুনলেই বোঝা যায়।

আভা বলল, পাটনায় বুঝি মেয়েদের গ্যাদা নেই?

ছেলেটি পাটনায় থাকে তাহলে। ওদের কথাবার্তা হাসি ঠাট্টার মধ্যেই হচ্ছিল। কিন্তু কী চায় ছেলেটা? আভার গায়ে হাত দিতে? কিংবা তার থেকে কিছু বেশী? কেন, এটা কি গ্রাম নয়? না কি আজ রাত্রে বাজসিদ্ধিতে কোনো বিধিনিষেধ নেই? অন্য মেয়ে দুটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও হাসি চাপতে পারছে না। নিজেদের গায়ে পড়াপড়ি করছে।

নিজেকে অপাংক্তেয় মনে হল একবার বিদ্যুতের। পরমুহূর্তেই

নিজেকে ধিক্কার দিল সে। সেকি এখানে মজা করতে এসেছে? এখানকার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসেনি সে? বরং ছেলেগুলিকে দেখে তার বোঝা উচিত, গ্রামের মন্দির সম্পর্কে এদের কোনো সাবধানতা আছে কি না। সজাগ দৃষ্টি আছে কি না। তার মানে এরা বাধাস্বরূপ হবে কি না।

কিন্তু এদের দেখে সেরকম কিছু মনে হয় না। বলতে গেলে এরা খানিকটা নিরীহই। কালীপুজোর রাত, ফূর্তি করতে হয়, ফূর্তি করছে। হয় তো একটু নেশা ভাং করে। মেয়েদের পেছনে লাগে, বাউরিদের বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকে, তাস পাশা খেলে। আর যারা ছুটির পর প্রবাসে যায়, তারা ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে।

—আপনি তো কলকাতা থেকে এসেছেন?

একজন হঠাৎ এগিয়ে বিদ্যুৎকে জিজ্ঞেস করল।—বড় তরফে?

বিদ্যুৎ সাবধান হল। বলল, হ্যাঁ।

আরো কয়েকজন এগিয়ে এল। আগের ছেলেটি বলল, তাস খেলবেন?

—না।

আভা বলে উঠল, তোদের আগেই বিদ্যুৎদাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, তাস খেলবেন কি না? উনি তাস খেলতেই জানেন না।

—তাই নাকি?

বিদ্যুৎ তাকিয়ে দেখল আভার দিকে। আভা তার দিকে তাকিয়ে নেই, কিন্তু খেলতে বারণ করাটা ঠিক বুঝিয়ে দিচ্ছে। এবং বিদ্যুৎকে বলতেই হল, না, তাস খেলতে জানি নে।

বলেই বিদ্যুতের মনে হল, দু' একবার পরীক্ষা করলে হত। কী খেলবে এরা? ফ্লিশ্ না ফ্ল্যাশ্? দুই-ই জানা আছে বিদ্যুতের। ভাগ্য পরীক্ষা একবার আজ রাত্রেই হয়ে যেতে পারত। বাজসিদ্ধির আসল ভাগ্য পরীক্ষা।

একজন হাসতে হাসতে বলল, কলকাতার লোক, তাস খেলতে জানেন না?

আভা জবাব দিল, না, লিখাপড়া করতে হয় তো।

আভা যে এরকম মুখরা হতে পারে, বিদ্যুৎ ধরতে পারেনি। এমন চোখ কুঁচকে, ঠোঁট বাঁকিয়ে কথা বলতে পারে, এতক্ষণ মনে হয়নি।

ছেলেগুলি যেন কেমন জুড়িয়ে গেল। মেয়ে দুটি বাইরের দিকে পা বাড়াল। বলল, আভা, যাচ্ছি। আসবার মন করলে আসিস, সেজ পিসির উপরের ঘরকে।

মেয়ে দুটি একবার তাকাল বিদ্যুতের দিকে। তারপর চলে গেল। ছেলেরা পটকা ফাটাতে আরম্ভ করল। আবার একটা তুবড়ি জ্বালানো হল।

বিদ্যুৎ একবার ভাবল, কোন্ দিকে যাবে। ঠাকুরদালানের পিছনে, না অন্য কোথাও। কিন্তু আভার চোখের ওপর দিয়েই পিছনে যেতে একটু দ্বিধা হল।

আভা বলে উঠল, বিছানা পেতে রেখেছি। ঘুম পেলে শুয়ে পড়বেন।

বিদ্যুৎ বলল, ও, আচ্ছা।

আভা আবার বলল, সত্যি তাস খেলতে জানেন না?

—জানি।

আভা একটু থমকে রইল। বলল, বেড়াতে এসেছেন, মিছামিছি জুয়া খেলে কিছু পয়সা খুইয়ে কী লাভ!

বিদ্যুৎ আভার চোখের দিকে তাকাল। কোনো জবাব দিল না।

আভা চোখ সরিয়ে বলল, আজ সারা গাঁয়ে অনেক জুয়ার আড্ডা বসেছে। মেয়েরাও খেলবে।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে বলে উঠল, তাই নাকি!

—হ্যাঁ। গোলকধাম, ষোল ঘুঁটি, তাস, সবই পয়সা দিয়ে খেলবে।

মীনাক্ষী চিনুদের সঙ্গে কালেভদ্রে ফিশ্ খেলেছে বিদ্যুৎ, কিন্তু বাজসিদ্ধির মেয়েরা আজ রাত্রে জুয়া খেলবে, এটা যেন তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর। বলল, তুমিও খেলবে?

আভা বলল, ভাল লাগে না। পয়সাও লাগে।

কথাগুলির মধ্যে ঈষৎ হতাশা এবং ব্যথার আঁচ পাওয়া যায়। পয়সা যদি বা আত্মীয়দের কাছে চেয়েচিন্তে আজকের দিনটিতে পাওয়া যায়। তবু ভাল না লাগাটাই যেন আসল।

আভার চোখ প্রতিমার দিকে। হঠাৎ ওর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটল। এরা বলে অবিশ্যি, আজ স্বামী স্ত্রীতে বাজী রেখে খেললে পুণ্যি হয়।

—কেন ?

—তা জানি না।

আকাশে শব্দ হল। হাউই! আলোর মালা দুলতে দুলতে পূব উড়ে গেল। আভা মুখ তুলে তাকাল। ওর মুখে হাউইয়ের অস্পষ্ট ঝিলিক লাগল। বিদ্যুৎ প্রতিমার দিকে চোখ তুলেই তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিল আবার। পিছনের অন্ধকারে ফিরে তাকাল।

আভা বলে উঠল, যাবেন ?

—কোথায় ?

ললিতারা যেখানে গেছে। ওরা সব খেলতে বসেছে এক জায়গায়।

—ললিতা আর ওর বর ?

—হ্যাঁ, সেখানে অনেক নতুন বর আর কনে আছে।

বিদ্যুৎ আবার তাকাল আভার দিকে। শ্লেষের হাসি ফুটে উঠতে চাইল তার মুখে। বর আর কনেদের আড্ডায় নিয়ে যেতে চায় আভা। প্রেমেই পড়ে গেল নাকি মেয়েটা! এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে! কিন্তু ওই দূরগামিনী চোখ, কথা ও চলাফেরার সাবলীলতা দেখে সেরকম ফুরফুরে মেয়ে বলে তো মনে হয় না। দেখল আভা যদিও অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু লক্ষ্য করছে তাকেই।

এখন করবেই বা কী। ঘুম যখন আসবে না, তখন আশেপাশে ঘুরে চারিদিকের অবস্থাটা দেখে নেওয়া ভালো। বলল, আমি গেলে বর কনেদের কোনরকম অসুবিধে হবে না তো ?

আভা বলল, আজ রাত্রে কেউ সুবিধে অসুবিধের কথা ভাবছে না।

—এই রাত করে তুমি গেলে, তোমাকে কিছু বলবে না ?

—কী আর বলবে। পুজো বসে গেছে। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে। এখন তো ছুটি। খেলাধুলো আড্ডা, যার যা ইচ্ছে।

তা বলে বয়স্কা মেয়েরা রাতবিরেতে গাঁয়ে ঘরে ঘুরবে! বিদ্যুৎ অবাক না হয়ে পারে না।

আভা কী বুঝল, কে জানে। হেসে বলল, এই তো ছোট্ট গাঁ, বাইরের লোক তো কেউ নেই। চারদিকে লোকজন জেগে রয়েছে, ঘুরছে। রাত দুপুরে মেয়েরা ঘুরলেও কোনো ভয় নেই।

—তবে চল।

আভা মুখ তুলে, একটি ছোট মেয়ের উদ্দেশে বলল, গীতা, মাসী খুঁজলে বুলিস কি, বিদ্যুৎদাকে নিয়ে গোলাবাড়িতে গেছি।

গীতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আভা রাস্তার দিকে পা বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। মেঘের অবস্থা বুঝতে চাইল বোধহয়। আচলটা বুকে গলায় ঢাকা দিল ভাল করে। বিদ্যুৎ তাকে অনুসরণ করল। পিছনে তুবড়ি জ্বলে উঠল আর একটা।

রাস্তায় পড়ে বাঁক নিতেই হ্যাজাকের আলো অদৃশ্য হল। গাঢ় অন্ধকার জড়িয়ে ধরল চারদিক থেকে। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ আর বলির পশু পথের দুধারে শুয়ে বসে রয়েছে। মাতাল গলায় কথা বলছে কেউ কেউ। মেয়ে এবং পুরুষেরা কেউ কেউ গান করছে। বোঝা যাচ্ছে তাদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। তারা দলে দলে আসছে দূরদূরান্ত থেকে। সারা-রাত্রিব্যাপীই নাকি আসবে। যতো আসবে বলির পশুর সংখ্যাও ততো বাড়বে।

একটা বাড়ির মধ্যে পুরুষে পুরুষে ঝগড়া হচ্ছে। এত খারাপ খারাপ কথা হচ্ছে, আভার সঙ্গে চলতেও অস্বস্তি হয়। কথাগুলি নিশ্চয় ওর কানেও ঢুকছে।

বোধহয় অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে আভা বলল, অন্ধকারে আপনার কষ্ট হচ্ছে, না ?

প্রায় অন্ধের মতোই আভাকে অনুসরণ করছিল বিদ্যুৎ। বলল, না, তেমন কিছু নয়।

—বেশী দূরে নয়, এসে গেলাম প্রায়।

আভা প্রায় পাশাপাশি হল বিদ্যুতের। অন্ধকার থেকে একটা পুরুষ গলা শোনা গেল, কে র‍্যা ?

—আমি আভা।

অ। কুথা যাল্‌ছিস ?

—গোলাবাড়ি। কে, পীতুকা ?

—হুঁ। সঙ্গে উটি ক্যা ?

—বিদ্যুৎদা। কলকাতা থিক্যা আসছে।

—অ।

অন্ধকারে একবার ছায়ার মতো যেন লোকটিকে দেখতে পেল বিদ্যুৎ। মদের গন্ধ গেল নাকে। কোথায় যেন ঢাক বেজে উঠল।

মাটির পাঁচিলের পাশ দিয়ে, একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল আভা। ডাকল, আসুন।

বিদ্যুতের মনে হল, সামনে একটা বড় উঠোন। উঠোনে গোটা চারেক মরাই। মরাইয়ের ওপারে আলোর রেশ। সেখান থেকে মেয়ে-পুরুষের হাসি এবং কলরব শোনা যাচ্ছে। ঘর আছে নিশ্চয়ই।

আভা ঢুকল। একটি বুড়োটে জড়ানো মেয়ে-গলা শোনা গেল, ক্যা বটে।

—আমি আভা। কে, দাখু।

—হুঁ। উঠতে লারছি গ, দরজাটো হুড়কো এঁটে দাও ক্যানে।

আভা দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, খুব গিলেছ বুঝিন ?

—কী করব। বাবুদিগের জামাইরা ছাড়ে না।

আভা হেসে বলল, তা বটে। আসুন।

আভার সঙ্গে মরাই পেরিয়ে, বিদ্যুৎ যেন এক অবিশ্বাস্য জগতে এসে দাঁড়াল। বেশ বড় ঘর, মাটির লম্বা দালান। ঘরে এবং বাইরে মেয়ে-পুরুষ গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে বসেছে। তাস, ঘুঁটি, গোলকধামের

কড়ির চাল চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে হল্লা, হাত-ছোঁড়াছুঁড়ি। বেশী বয়সের কেউ নেই। নতুন বিবাহিতের দল বলেই মনে হয়। বাউরিদের ঘরের দু'চারজন অল্পবয়সী মেয়েও আছে। কিন্তু ছোট ছোট কাঁচের গেলাসে পানীয় এবং গন্ধ পেয়ে শহর-ঘাঁটা বিদ্যুৎও যেন থতিয়ে গেল। এবং কোন কোন মেয়ের মুখ দেখেই বোঝা গেল, পানীয় তাদের পেটেও কিছু কিঞ্চিৎ গিয়েছে। চোখ তাদের ঢুলু ঢুলু নয়, শাণিত হয়ে উঠেছে। মুখ দপ দপ করছে। এসেন্স স্নো পাউডারের সঙ্গে মদের হালকা গন্ধ মিশেছে। চুড়ির ঝনাৎকারের সঙ্গে খিলখিল হাসি ফেটে পড়ছে।

বিদ্যুৎ দেখল, খেলোয়াড়দের মধ্যেই একটি পুরুষ আর একটি মেয়েকে শাড়ি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বরকনেই নিশ্চয়। খেলতে খেলতে দুজনেই টানাটানি করছে। তাতে জড়াজড়ি হচ্ছে আরো বেশী। হেসে হাততালি দিচ্ছে সবাই।

জোড়া জোড়া বর, জোড়া জোড়া কনে তাস খেলতে বসেছে। সকলেই কথা বলছে, সকলেই হাসছে। কারুর কোনো কথাই বোঝা যাচ্ছে না।

—ই ত্যাখ, ই ত্যাখ, চুরি করছে।

একজন বর চীৎকার করে উঠল, এবং সম্ভবত নিজের স্ত্রীরই কাঁধের জামা টেনে ধরল। মেয়েটি হাসতে হাসতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। একটি মেয়ে বলে উঠল, চুরি করেছে তো আদায় কর্যা লাও, আদায় কর্যা লাও।

পরমুহূর্তেই দলটার সামনে যে হ্যারিকেন ছিল, কে একজন হাত বাড়িয়ে তার আলো একেবারে কমিয়ে দিল। একটা উচ্ছৃঙ্খল হাসি ফেটে পড়ল। টানাটানি ধস্তাধস্তি চলল খানিকটা। তারপর মেয়েটিরই গলায় বোধহয় হাঁপিয়ে-পড়া হাসির সঙ্গে শোনা গেল, আচ্ছা লাও ক্যানে, লাও, গোলামটো লিয়ে লাও।

আবার বাতি বাড়িয়ে দেওয়া হল। আর এমন সময় একজন প্রায় টলতে টলতে বিদ্যুতের কাছে এসে তার হাত চেপে ধরল।

বলল, এই যে, দাদা আসছেন, আসেন। আপনার বুনটি আমাকে বড় নাজেহাল করছে।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে দেখল, ললিতার বর। মুখে মদের গন্ধ। চোখ টকটকে লাল। বোঝা যাচ্ছে, নেশার ঝোঁকে এখন তার লজ্জা নিপাত গিয়েছে। মুখচোরা হাসি আর নেই, নত মাথা এখন উদ্ধত।

ললিতা উঠে এসে বরের জামা টেনে ধরল। এখন বুঝতে পারল বিদ্যুৎ, আভা বলছিল, ললিতা হয়তো সিদ্ধি খেয়েছে। সিদ্ধি নয়, বাজসিদ্ধির এই মহানিশায় ধর্মতঃ সে কারণবারি-ই পান করেছে। বরকে টেনে ধরে বলল, অ্যাই, দান না দিয়্যা পালালছ কুথা?

তারপর বিদ্যুতের দিকে নজর পড়তেই বলে উঠল, বিদ্যুৎদা আসছ? আস ক্যানে, আস। ই দ্যাখ ক্যানে, মশায়টোর আর খেলবার মতলব নাই, আন মতলব মাথায় ঢুকেছে। আমাকে ইশারা করছে উঠে পড়তে।....ই, আই আভা, তু বিদ্যুৎদাকে লিয়ে বস।

ললিতা দু হাতে বরকে জড়িয়ে ধরল। আঁচল লুটিয়ে, বরকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

কে বলে উঠল, বাঁধ, বেঁধে ফ্যাল্। শাড়িটো খুলে নিয়ে উয়াকে বেঁধে রাখ্।

বিদ্যুৎ লক্ষ্য করছিল, তার অপরিচিত সার্ট প্যাণ্ট পরা উপস্থিতিতে কেউ কেউ সঙ্কুচিত হচ্ছিল। অস্বস্তি বোধ করছিল।

কিন্তু তার চোখের সামনে এই দৃশ্য, এই ঘটনা যেন সে তখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। কলকাতার মধ্যে রাত্রের অনেক পানশালা নৃত্যশালা সে দেখেছে। তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই ঠিকই। সেখানে সবটাই কেনা-বেচার হাট। নাগরিক জীবনের অবসর উন্মাদনা বিকারের প্রাত্যহিক লীলাক্ষেত্র। আর এখানে, এটা একটা অনুষ্ঠান। ধর্ম এবং সংস্কারের নির্দেশে সব কিছু ঘটছে। এই দূর নির্জন নিঝুম বাজসিদ্ধি গ্রামে, বছরের এই একটি রাতই হয়তো একমাত্র ব্যতিক্রম, বৈচিত্র্যময়। একদিন কিংবা দুদিনের জন্য সমাজ তাদের অধিকার দিয়েছে। তবু নগর এবং গ্রাম, সমস্ত

পৃথিবীটা যেন একাকার হয়ে গেল বিদ্যুতের কাছে। সমস্ত কিছুর মূল যেন এক জায়গায়। যেন মানুষ তার সেই আদিমতার সঙ্গে লড়ছে, দৌড়ুচ্ছে এবং আগুন আরো লেলিহান হয়ে তাকে বেষ্টন করছে। আর বিদ্যুৎ আবিষ্কার করল, আজকের ভয়ার্ত কম্পিত রুদ্ধশ্বাস পৃথিবী থেকে বাজসিদ্ধি একেবারেই বিচ্ছিন্ন নয়। বাজসিদ্ধির বুকের ওপরেই আধুনিক পৃথিবীর একটা প্রতীক ছবি ফুটে উঠেছে।

বিদ্যুতের চোখে বিস্ময়, কিন্তু রক্তের স্তব্ধ ধারায় একটা কলধ্বনিও যেন বাজছে। এই রঙ্গ, মেয়েদের এই বিস্রস্ত বেশবাস, পুরুষদের নির্বিচার ব্যবহার তাকেও প্রমত্ত হতে প্ররোচিত করছে যেন। অথচ, এই মুহূর্তেই রুদ্রভৈরবের মন্দির তার চোখের সামনে ভাসছে। তার ভবিষ্যৎ, তার চির-স্তব্ধতার জাগরণ। না, এ এক রাত্রির বিভ্রান্তিতে সে ভুলবে না। বরং বাজসিদ্ধির এই প্রমত্ততা তাকে ভরসা দিচ্ছে, আগামীকাল সন্ধ্যায় নিশ্চিত এই বাজসিদ্ধি গভীর ঘুমে ঢলে পড়বে।

আসলে, এদের সঙ্গে মেতে যাবার প্ররোচনাটা চোখের ক্ষুধার মতোই। চোখের নেশাটাও এক রকমের নেশা। তার পাশে, আভার নির্বাক স্তব্ধতাও অবাক করছে। আভাও যেন বাইরে থেকে এসেছে। সে বুঝতে পারছে, আভা তাকেই লক্ষ্য করছে। সে কোন্ দিকে, কার দিকে তাকাচ্ছে।

—বসবেন নাকি?

আভা অন্য দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

বিদ্যুৎ বলল, না।

এবং আশ্চর্য, বিদ্যুতের মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আস্তে আস্তে সে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।

একজন বর চীৎকার করে উঠল, আভাদি, আসেন ক্যানে, এক হাত খেলে যান।

আরো কয়েকজন সায় দিল। আভা বলল, না, আমি খেলব না।

—ক্যানে? আমাদিকে পছন্দ হচ্ছে না?

আর একজন বলল, আইবুড়ো যে! কার কোলে বসে খেলবে?

আভা বলল, চলুন, বাইরে যাই।

চীৎকার উঠল, পালালছে, পালালছে।

বিদ্যুৎ আর আভা অন্ধকার উঠোনে এসে পড়ল। উঠোনে এসে দুজনের গতিই মন্থর হয়ে গেল। যেন কেউ তাদের মন্ত্রাচ্ছন্ন করল। গোলাবাড়ির বিশাল অন্ধকার উঠোনে তারা মন্থর পায়ে পায়চারি করতে লাগল। অথচ, কথা বলতে পারছে না।

ঢাকের শব্দ আসছে। পশ্চিমা বাতাস বইছে তেমনি। আকাশ গাঢ় কালিমায় ঢাকা। কাছেই একটা তালগাছের পাতায় পাতায় ঝাপটা লাগছে।

খানিকক্ষণ পর বিদ্যুৎ বলল, আমার জন্যে হয়তো তুমি কোথাও যেতে পারছ না।

—আমি কোথাও যাব না।

—ওদের সঙ্গে খেলতে পারতে।

—ভাল লাগে না।

এর ওপর কথা নেই। বিদ্যুৎ না বলে পারল না, এদের সঙ্গে তোমার যেন ঠিক মিল নেই।

আভা জবাব দিল না। বিদ্যুতের মনে সংশয় অবিশ্বাস বিদ্রূপ জেগে উঠল না আভার প্রতি। রাতারাতি প্রেমে পড়বার মতো কোনো চিহ্নই নেই। বরং অন্ধকার, এই নির্জন উঠোনে, আভা আর এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার মনকে স্পর্শ করল। সে হঠাৎ বলে উঠল, কোন কারণে তোমার মন বোধহয় খারাপ আছে, না?

আভা বলল, না, মন খারাপ করে কী করব।

একটু থেমে আবার বলল, আমার খালি মনে হয়, আমি যেন জেলখানায় আটকে আছি। সে জন্য আমার কিছু ভাল লাগে না।

বিদ্যুতের সঙ্গে যেন পুরনো পরিচয়। এমনি ভাবে বলল আভা। আসলে দুজনের মধ্যেই একটা আবেগ উপস্থিত হয়েছে। আর অন্ধকার দ্বিধা ঘোচায়, নৈকট্য বাড়ায়। বিদ্যুৎ বলল, জেলখানায়?

সেই রকমই। তা বলে কি আর সত্যি হাত পা বাঁধা? তা

না। অথচ মনে হয়, আমি যেন আটকা পড়ে আছি। কোথায় যে যাব তাও জানি নে। আসলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

বিদ্যুতের মনে হল যেন সেই বন্দিনী রাজকন্যে। রূপকথার সেই রাক্ষসপুরীর রাজকন্যের মতো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ওর বাবা নেই, মা নেই। ভাই নেই, বোন নেই। ছেলেবেলা থেকেই ওর একাকীত্ব এক মুহূর্তের জন্যেই ঘোচেনি। স্বভাবতই উৎসবে আনন্দে সেই একাকীত্ব আরো বেশী করে জেগে ওঠে, বেশী করে বাজে।

বিদ্যুৎ সহসা আভার গায়ের কাছে সরে এল। আভা আবার বলল, কাজ করলে আমি বেশ ভাল থাকি। সে জন্যে, আমার ওপর সকলের রাগ। বলে, তুই একটা বুড়ি থুত্থুড়ি।

হেসে ফেলল সে। এবং পরমুহূর্তেই আবার বলল, আপনি যখন এলেন, আপনাকে দেখে আমার খুব অদ্ভুত লেগেছিল।

—কী রকম ?

—আপনি যেন চুপি চুপি এলেন। যেন কাকে খুঁজতে এলেন, আর খুব যেন চিন্তায় পড়ে গেছেন। আত্মীয়দের পূজোর বাড়িতে আসেননি যেন।

জানত বিদ্যুৎ, ওই চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সে হঠাৎ সাবধানী হয়ে উঠল। একটু সন্ত্রস্তও। আর নয়। আর আভার সঙ্গে নয়। হঠাৎ যেন তার মনে পড়ে গেল কী জন্য সে এসেছে। তার মুখ শক্ত হয়ে উঠল। মনে হল, তাকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র এই মেয়েটার রূপ ধরে পিছনে পিছনে ফিরছে। এ-ই শুধু তাকে দেখছে, বুঝতে পারছে।

সকলের মত্ততার মধ্যে ও-ই একমাত্র সচেতন স্থির। এর সঙ্গে আর নয়। সে বলে উঠল, এখানে আর ভাল লাগছে না। আমি বাইরে চলে যাচ্ছি।

বলেই সে দরজার দিকে পা বাড়াতে উদ্যত হল। আভা বিস্মিত অসহায় আর্ত গলায় বলে উঠল, রাগ করলেন আমার ওপর ?

আশ্চর্য ! আভার গলার স্বরটা যেন বুকের মধ্যে বিঁধে একটা

চকিত ব্যথায় থমকে দিল এবং হঠাৎ একেবারে বিপরীত ক্রিয়া হল তার। সে আভার হাত ধরে ফেলল। বলে উঠল, না না।

আর সেই মুহূর্তেই অনুভব করল, আভার হাতটা তার হাতের মধ্যে যেন সপ্রশ্ন বিস্ময়ে থমকে, শক্ত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিল আবার। নিজেকে নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠল সে। কী করবে, কিছু স্থির করতে পারল না। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, রাগ করিনি।

আভা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বিদ্যুতের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। এত কাছে যে তার শাড়ি স্পর্শ করল বিদ্যুৎকে। আর হঠাৎ বিদ্যুতের হাতটা ধরল। বলল, আপনার হাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা।

কিন্তু বিদ্যুতের মনে হল, আভার হাত তার থেকে গরম নয়। বুঝল, সে আভার হাত ধরেছিল বলে, একটু অবাক হলেও, কিছু মনে করেনি। সে কথা বোঝাবার জন্যেই তার হাত ধরেছে আভা।

বিদ্যুৎ বলল, আমার ব্যবহার সব সময়ে ঠিক—

কথাটা মাঝ পথেই ছেড়ে দিল সে। আভা বোধহয় অপেক্ষা করল, কথাটা শেষ করে কি না বিদ্যুৎ। তারপরে বলল, আমি তো সেই কথাই বলছিলাম। আমার মনে হল, আপনি কথা বলছিলেন আর অন্য কথা ভাবছিলেন। কেমন যেন আপনাকে—আপনাকে—

বিদ্যুৎ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে, প্রায় চাপা গলায় বলল, আমাকে—?

—আপনাকে কেমন যেন দুঃখীর মতন—মানে—কী যেন অশান্তি, কি যেন কষ্ট—

থেমে গেল আভা। ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বলল, রাগ করবেন না যেন।

—না, রাগ করব কেন।

আভা নীচু গলায় টেনে টেনে বলল, কেমন যেন বেমানানবেমানান মতন। ঠিক মতন দেখলে কেমন নজরে পড়ে যায়।

বিদ্যুৎ বলল, ঠিকই বলেছ। আমি এসেছি, অনেক দিনের একটা

ইচ্ছে বাজসিদ্ধির কালীপূজা দেখব, তাই এসেছি। লোকের মুখে অনেক কথা শুনেছি, এমন কি, বাজসিদ্ধির কথা বইয়েতেও পড়েছি। কিন্তু মনটা এত খারাপ, ঠিক কি বলে বোঝানো যায়, জানি নে। সংসারে দুঃখ তো অনেক রকমের, আর ছেলেরা বেকার হলে. বোধ হয় অরক্ষণীয়া মেয়েদের থেকেও তাদের অবস্থা খারাপ, তখন দুঃখকে আরো বড় মনে হয়। ঘরে বাইরে অপমান—। সে কথা যাক। এ তো আমারই ভুল, এ সব পূজো পার্বণে কোথাও যাওয়া। হাসতে পারি নে, মিশতে পারি নে। ভাল লাগছে অথচ কিছুই ভাল লাগছে না, এটা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। তাই বলছিলাম, আমার নিজের ব্যবহারের কিছু মাথামুণ্ডু নেই, রাগ করব কার ওপর।

বিদ্যুতের মনে হল আভা ওর নিজের সম্পর্কে যা বলছিল, সেও প্রায় এক কথাই বলল। তবু স্বস্তি পেল বিদ্যুৎ। ভাবল, তার প্রতি নিবিষ্ট দূর বিদ্ধ দুটি চোখ ও একটি মনকে সে বেশ ফাঁকি দিতে পেরেছে। আভার ওপর আর রাগ করা যাচ্ছে না, রেগে সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বরং একটা নৈকট্য প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। অথচ কেন যেন মনে হয়, এই চোখ দুটিই তার সব কিছু ধরে ফেলতে পারে। এই চোখ দুটির দিকে তাকালেই প্রতিমার চোখ মনে পড়ে যায়। আর মীনাক্ষীরও। তখন বুকটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তার চেয়ে এর মনে একটা ধারণা স্বষ্টি করে রাখা ভাল। কেন না, এ মেয়ে যে কোন মুহূর্তেই একটু হেসে চুপি চুপি বলে উঠতে পারে, আপনি চুরি করতে এসেছেন না ? আপনাকে যেন চোর চোর লাগছে।

তখনো আভা বিদ্যুতের হাতটা ধরে রয়েছে। বিদ্যুতের কথাগুলি শুনতে শুনতে দু' একবার নড়ে উঠেছিল ওর হাত। একবার যেন মুঠি শক্ত করে ধরেছিল। ,মুখ তুলে অন্ধকারেও বিদ্যুতের মুখ দেখতে চেষ্টা করল বোধহয়। বলল, তাই, তাই বোধহয় আপনাকে—

—কী ?

আভা সম্ভবত কথাটা ঘুরিয়ে বলল, বলছিলাম, এক একজনের চোখে এক একজন যেন কেমন চেনা হয়ে যায়।

বিদ্যুৎ বলল, হ্যাঁ, অনেকটা একজাতের অচেনা মানুষের হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার মতো।

আভা আবার তাকাল। তারপর, খানিকটা অনিচ্ছাভেই যেন তার হাতটা শিথিল হল। আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল বিদ্যুতের হাত। বলল, কিন্তু জানেন, বি. এ., এম.এ. পাশ বেকারের কথা আমি লোকের মুখে শুনেছি। কোনদিন চোখে দেখিনি। শুনে আমার খুব অবাক লাগত। ভাবতাম, সবাই মিছে কথা বলে। তাই কি কখনো হয়?

সকরুণ বিদ্রূপে ঠোঁটের কোণ কুঁচকে উঠল। যদিও আভাকে অবিশ্বাস করল না সে। বলল, তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। এই বাজসিদ্ধিতে আপনার মতন বড় বড় ছেলে অনেক বেকার আছে। কিন্তু তারা লেখাপড়া করে না, বাইরেও তেমন যায়নি। তারা আপনার মতন নয়। তারা সন্ধ্যে হলে মদ খায়, বাউরিদের বাড়িতে ঢোকে, না ঢুকতে দিলে জোর করে, মারামারি করে, ঘুমোয়, ভাত খায়, তাস পাশা খেলে, ঘরের ধান বেচে সিনেমা দেখতে যায় তিরিশ মাইল দূরে। মনে হয় না, ঘরে বাইরে তাদের আবার কোনো মান অপমান জ্ঞান আছে। বেশ ভাল আছে সব। যমেরও অরুচি। মেয়েরা ওদের ভয় পায়।

বিদ্যুতের ঠোঁটের কোণ দুটি কুঁচকেই রইল। মনে মনে বলল, যমেরও অরুচি। মুখে বলল, এটাও বোধহয় এক রকমের বেকারির জ্বালা। কলকাতায় যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে, এখানে তা ধোঁয়ায়। হয়তো ক্ষেতে দু মুঠো ধান আছে, তাই চাবুক তেমন লাগে না। কিন্তু শাপ আর পাপটা এক রকমই। কলকাতায় বেকারের লুকোবার জায়গা নেই, স্থির হবার উপায় নেই। যেন অন্ধকারে সার্চ লাইট ঘুরছে তার পিছু পিছু। আর সে ছুটছে। পাপ করছে। এখানে হয়তো নির্বোধের মতো পাপ করছে, কলকাতায় ধূর্তের মতো। বেকার মানেই পাপী।

অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ঘন সন্নিধানে প্রায় পরস্পরের গায়ে গা ঠেকছে। অবয়ব টের পাচ্ছে। তবু বোঝা যায়,

আভা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। বলল, এত জানি না, বুঝি না। আপনাকে পাপী বলে কিন্তু আমার মনে হয় না।

বিদ্যুতের ঠোঁটের কোণে শ্লেষ কুঞ্চন আরও তীব্র হল। আভা হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ভগবান আপনাকে কেন বেকার রেখেছেন!

বিদ্যুৎ হেসে বিদ্রূপ কঠিন গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দুপদাপ পায়ের শব্দ এবং চুড়ির ঝনাৎকার শোনা গেল। কেউ যেন কাছেই একটা মরাইয়ের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলল কেউ কাউকে। পরমুহূর্তেই চাপা মেয়ে গলায় শোনা গেল, না, উ কী!

পুরুষ গলায় শুধু শোনা গেল, হুঁ।

মরাইয়ের গায়ে আর এক দফা ধস্তাধস্তি, খড়ের খস্‌খস্‌, অলঙ্কারের নিক্কণ, রুদ্ধ হাসির চাপা স্খলিত ঝংকার শোনা গেল।

বিদ্যুৎ স্তব্ধ আভার পাশে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চকিতের জন্য তার মনে হয়েছিল, কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে হয়তো। পলক পরেই, বিস্ফারিত চোখে সে অন্ধকারে মরাইগুলির দিকে তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না। এবং সেই মিলিত শব্দের মধ্যে, সহসা যেন তীরের মতো এসে বিঁধল চুম্বনের শব্দ। তারপর ঈষৎ হাসি এবং স্তব্ধতা।

পরমুহূর্তেই ঘরের দিক থেকে আলো ছিটকে এলো বাইরে। মেয়ে গলা শোনা গেল, কই, কুথা গেল টোতে?

আভা চুপি চুপি বলল, চলুন, চলে যাই। ওই দুজনকে খুঁজতে আসছে ওরা।

বলতে বলতে আভা এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে নিঃশব্দে। দুজনে বেরিয়ে এল বাইরে। উঠোনের মধ্যে ততক্ষণে হাসির কলরোল ফেটে পড়েছে।

বাইরে এসে মনে হল, গোটা বাজসিদ্ধি গ্রামটার চারপাশে শুধু ঢাক বাজছে, গ্রামটা তার তালে তালে দুলছে। কাছে দূরে, সর্বত্র

মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে আলোর ঝিলিক হানছে। কোথাও কোথাও এখনও বাজী পুড়ছে, বোঝা যাচ্ছে। কেবল গাঢ় অন্ধকার আর মেঘ গ্রাস করে আছে গ্রামটিকে।

বিদ্যুতের মস্তিষ্কে তখনও একটা উদ্‌ভ্রান্ত শূন্যতা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল কোথায় এসেছে, কেন এসেছে। তার দু হাত আগে আগে আভা চলেছে। কথা বলছে না। বিদ্যুৎও কথা বলতে পারছে না।

খানিকক্ষণ চলে আভা বিদ্যুতের পাশাপাশি হল। প্রায় অপরাধী গলায় বলল, কারুর মাথার ঠিক নেই।

বিদ্যুৎ ভাবল, আভা কথাটা তাকেই বলল কি না। কারণ সেই মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, তার নাকে আভার চুলের গন্ধ যাচ্ছে। তার জীব প্রবৃত্তি যেন আভাকে লক্ষ্য করছিল। সে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ চোখে আভাকে দেখতে চাইল। মনে মনে বলল, আভার মাথাই শুধু ঠিক আছে।

আভা আবার বলল, আর হবে না-ই বা কেন। এ গাঁয়ে আজ যত পূজো, কোন পূজোতেই ঘট থেকে শুরু করে কিছুতে জলের ছিটেটিও নেই।

বিদ্যুৎ বলল, সে কি, কেন?

—নিয়ম! জলের বদলে কারণ, মদ যার নাম। অর্ঘে, উৎসর্গে, নৈবেদ্যে, মায় চন্দনও মদ দিয়ে বাটা। যে পূজোর যে বিধি!

এরকম পূজা বিধির সামান্য ধারণা ছিল বিদ্যুতের। এমন প্রত্যক্ষ লীলা দেখা ছিল না। বলল, তবে সবাইকেই আজ ও জিনিস ঘাঁটতে হয়েছে?

—হয়েছে, হচ্ছে, কারণ, পূজোর মদ তো বাড়িতেই চোলাই করতে হয়। কেনা মদ দিয়ে পূজো হয় না। অবিশ্যি মেয়ে বউদের কষ্ট হয় বলে অন্য বিধানও আছে। যাতে কম ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। ডাবের জল কাঁসার বাসনে ঢাললে তাও মদের সমান। ওই মিশিয়ে কাজ সেরে নেয় কিছু।

'বিদ্যুৎ কথাগুলি শুনছিল। কিন্তু গোলাবাড়ি থেকে বেরুবার শেষ মুহূর্ত থেকে বাজসিদ্ধির এই রাত্রির নিশি যেন তার প্রবৃত্তিকে স্পর্শ করেছে। আভার দেহে তার দৃষ্টি বার বার বিদ্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি স্পর্শকে আরও ঘন করবার প্ররোচনা দিচ্ছে কেউ ভিতর থেকে। অথচ একটু আগেই আভা তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল।

—দেখিস্, গায়ে পড়িস নাই।

আভা বলে উঠল, বিদ্যুৎ চমকে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অন্ধকার থেকে পুরুষের গলা শোনা গেল, না রে। তু যা, যা ক্যানে।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে দেখল, বিপরীত দিক থেকে প্রায় তার গা ঘেঁষে একদল লোক হুড়মুড় করে চলে গেল। মাদলে শব্দ উঠল ঠুং করে। পাঁঠার গন্ধ গেল নাকে। সাঁওতালদের একটা দল।

বিদ্যুৎ বলল, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

আভা বলল, অন্য একটা পাড়া দিয়ে বাড়ি ফিরছি। এ পাড়াতেও একটা পূজো আছে, সেজ তরফে। যাবেন?

—থাক গে।

বিদ্যুৎ এগিয়ে গেল। বুঝতে পারল, তাকে পুরুষ সঙ্গী হিসেবে নিয়ে আভা আসলে একটু পূজোর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে চাইছে। কিন্তু এই মুহূর্তে, বিদ্যুতের সমস্ত অনুভূতি যেন একটা বিদ্যুতে এসে পৌঁছুচ্ছে। আভার গায়ের কাছ থেকে সরতে পারছে না সে। আভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও কল্পনায় যেন সবই দেখতে পাচ্ছে। দৃষ্টিকে নত করে এনেছে।

আভা বলল, ছয়ের তরফে যাবেন? এখনো অনেক হাউই ছাড়বে ওরা।

বিদ্যুৎ বলল, হাউই আকাশেই ভাল লাগে। নতুন কিছু আছে ওখানে?

—না, নতুন আর কি থাকবে। পূজো সবই এক।

বিদ্যুৎ সহসা আভার কাঁধে হাত তুলে দিল। এবং প্রায় রুদ্ধ স্বরে বলল, বড্ড অন্ধকার, দেখতে পাচ্ছি নে।

আভা চকিতের জন্য থমকাল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু দ্বিধাহীন স্পষ্ট গলায় বলল, আমাকে ভাল করে ধরুন।

বিদ্যুতের মনে হল, আভা তাকে ঠাট্টা করল। তাই আভার বলিষ্ঠ, অথচ মেয়েলি-নরম কাঁধে জোর করে হাত বসাতে পারল না। কিন্তু হাত নামিয়ে আনতেও পারল না। লজ্জা করল, তবু মস্তিষ্কের মধ্যে তার মোহগ্রস্ত প্রবৃত্তির ভেজা মাটি খুঁড়ে লাল জড়ানো কেঁচোর মতো বাসনা যেন উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল। তার সঙ্গে এই অন্ধকার, এই আদিম অন্ধকার, নারী-পুরুষের আলিঙ্গন, হাসাহাসি, ধস্তাধস্তি, চুম্বন ইত্যাদি সকল কল্পনা, স্বাদ, তাড়না করতে লাগল। সেই তাড়নায় লজ্জা অপসারিত হল। বিদ্যুতের হাত কাঁধ থেকে গ্রীবায় স্পর্শ করল আভার। যেন গলা টিপে ধরতে চায়। আসলে স্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং আবার কাঁধে হাত নেমে এল, আর কাঁধের বাঁধ ডিঙিয়ে দেহের সম্মুখ ভাগে নেমে যাবার অস্থির উত্তেজনায় সহসা থমকাল। যেন ছোবল দেবার পূর্বমুহূর্তের অনুসন্ধিৎসু একাগ্রতায় স্থির।

আভার নিজের হাত উঠে এল কাঁধে, অবলীলাক্রমে বিদ্যুতের হাতটা ধরল কেন? বিদ্যুতের মনে হল, হাতটা আভার হাতের মধ্যে এখুনি থরথর করে কেঁপে উঠবে। সে হাত শিথিল করতে চাইল। পারল না। টেনে আনতে চাইল। পারল না। আড়ষ্ট শক্ত হয়ে রইল।

আভার ওর আর একটি হাতও তুলে নিয়ে এল। দুহাতে বিদ্যুতের হাত চেপে ধরল। যেন বিদ্যুৎকে সে প্রায় কাঁধে টেনে নিয়ে দু'হাতে ধরে বহন করে নিয়ে চলেছে। বিদ্যুৎ যেন একটা বেদনার্ত কষ্ট দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রইল।

হঠাৎ আভা দাঁড়াল। একটা গাছের সামনে, নিকষ-কালো অন্ধকারে দাঁড়াল। অদূরেই একটি টিমটিমে হ্যারিকেনের রক্তিম আলোয় কতগুলি মানুষের মূর্তি দেখা গেল। আর তাদের নানান ধরনের কথা।

—আঃ, বাপ ব্যাটায় কি ছ্যাঁচড়ামো করছ গ।

—ই কি বাপু পুজোপাটের দিনে—

—ছিঃ ! এ্যাই, এ্যাই হেমা, তু যা, খা'ক্যানে—

বোধহয় হেমার গলাই শোনা গেল, ক্যানে যাব ! বাপ বুড়া হয়্যা মরতে চলল, সে ছুঁড়ির কাছকে যেতে পারে, তাতে দোষ হয় না, অ্যাঁ !

—চোপ, চোপরাও শালো, আমি তুর বাপ, আমি লারাণ বাঁড়ুজ্জে। তু আমার গায়ে হাত তুলে দ্যাখ, ঢুকে দ্যাখ একবার হিদে বাউরিদের ঘরে—

—কী, করবে কী ?

যেন ধস্তাধস্তি লেগে গেল। সবাই একযোগে হৈ-হৈ করে উঠল। টিমটিমে হ্যারিকেনের রক্তিম স্তিমিত আলোয় অন্ধকার ও মানুষ-গুলিকে আরও আদিম মনে হতে লাগল।

বিদ্যুৎ অস্ফুটে একবার জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে ?

আভা বলল, ওই, মদের ঝোকে, বাপ ছেলে হয়তো একসঙ্গে হিদের বাড়ি ঢুকতে গেছে। দেখা হয়ে গিয়েছে, তাই লেগেছে। মানুষ যে কী !

বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, হিদের বাড়িতে কী হয়েছে ?

—হিদের বউ আছে।

বলে, সেই ভাবেই বিদ্যুতের হাত ধরে চলতে চলতে আভা বলল, বাপ ছেলে দুজনেই সেখানে—আর বউটাই বা কেমন ? মানুষ—

চুপ করল আভা। একটা নিঃশ্বাস পড়ল হঠাৎ। বলল, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে এই অন্ধকারে চলতে।

বলে মুখ ফেরাল। আর ওর নিঃশ্বাস লাগল বিদ্যুতের গলার কাছে। মুখ ফিরিয়ে আবার বলল, এবার কিন্তু রাস্তা আরও খারাপ। সাবধানে।

বিদ্যুতের হাত সে আরও জোরে চেপে ধরল। কিন্তু বিদ্যুতের মনে হল, সে হাঁপাচ্ছে। তার মস্তিষ্কটা একেবারে শূন্য। প্রবৃত্তির

করাঘাত সেখানে আর বাজছে না। এবং অন্ধকারে আভার সেই অপলক দূরবিদ্ধ চোখ দুটি সে ভেসে উঠতে দেখল। যেন বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটু একটু করে আকর্ণবিস্তৃত প্রতিমার চোখের মতো হয়ে উঠল সেই চোখ এবং পরমুহূর্তেই মীনাক্ষীর মতো যেন নিঃশব্দে হেসে উঠল। বিদ্যুৎ সত্যি সত্যি হোঁচট খেতে লাগল।

আভা বলে উঠল, ইস্!

বিদ্যুৎ যেন এবার সত্যি এলিয়ে পড়ল, আর আভা তাকে বহন করে চলতে লাগল। এবং হঠাৎ একটা খোলা দরজার কাছে আভা দাঁড়াল। সেখানে হ্যারিকেনের স্বচ্ছ আলো এসে পড়েছে। দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যায় উঠোন। উঠোনের মাঝখানেই হ্যারিকেন রয়েছে।

বিদ্যুৎ যেন ঘুম-ভাঙা চোখে তাকাল। উঠোনটা তার চেনা মনে হল। মনে হল, দড়িতে ভেজা কাপড় মেলে দেওয়া এই উঠোনটা তার চেনা। সে স্তিমিত গলায় জিজ্ঞেস করল, এটা কোন বাড়ি?

আভা হেসে বলল, আমাদের বাড়ি। খিড়কী দিয়ে এলাম।

বিদ্যুৎ দেখল আভার মুখে আলো পড়েছে। তার মুখে একটি নিষ্পাপ, বোধহয় করুণ, অথচ স্নিগ্ধ হাসি লেগে রয়েছে। আর সেই চোখ। সেই চোখ তুলে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

বিদ্যুৎ মুখ নামিয়ে উঠোনের দিকে তাকাল। সহসা মনে পড়ল, সে কোথায় এসেছে, কেন এসেছে। ওই মেলে-দেওয়া কাপড়গুলির ওপারেই তো পশ্চিমের ঘর। যেখানে সেই ব্যাগ রয়েছে। ভিতরে ভিতরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শক্ত হয়ে উঠল। সে কি তার আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাচ্ছে! বিঘ্ন তার পিছনে পিছনে ফিরছে!

আভাই জিজ্ঞেস করল, কী হল?

বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি বলল, না, এই রাত আর অন্ধকারটা অদ্ভুত।

আভা হাসল। বলল, শোবেন এখন? একটু ঘুমোন না।

—ঘুম আসছে না।

—তবে কী করবেন এখন?

বিদ্যুৎ বলতে পারল না, ঠাকুর-দালান এবং মন্দিরের পিছনের অন্ধকার অঞ্চলটা তাকে হাতছানি দিচ্ছে। বলল, কী আর করব। তুমি কি করবে ?

আভা বলল, আমার তো ছুটি ফুরিয়ে গেল। এখন মামী যা বলবে, তাই করব। সারারাত্রিই কাজ, পূজোর ওখানে গিয়ে হয়তো বসতে হবে।

বিদ্যুৎ বলল, আমিও কাছে-পিঠেই একটু ঘুরে বসে সব দেখব।

আভা একটু তাকিয়ে থেকে বলল, তবে চলুন, এ দরজা দিয়ে ঢুকে সদরে যান।

উঠোনে ঢুকে, মেলে-দেওয়া কাপড় সরাতেই, হ্যাজাকের আলো বিদ্ধ সেই গলিটা চোখে পড়ল। বিদ্যুৎ সেদিকে এগিয়ে গেল। আভাও আগের মতোই এগিয়ে এল। বলল, আমি পূজো-দালানে, নয়তো বাড়িতেই থাকব।

কেন বলল আভা একথা। বিদ্যুৎ বলল, আচ্ছা।

—কোনো দরকার হলে আমাকে বলবেন।

—আচ্ছা।

আভার গলার স্বর নীচু হল। বলল, আবার বেরুতে ইচ্ছে করলে আমাকে বলবেন, অ্যাঁ ?

যেন ছোট মেয়েটি, একটা খুশির ঢেউ দিয়ে বলে উঠল।

বিদ্যুৎ আবার বলল, আচ্ছা।

এবার আভা চট করে নিজেই সরে গেল। বিদ্যুতের একটা নিঃশ্বাস পড়ল সহসা। সে গলি পেরিয়ে, ঠাকুরদালানের উঠোনে এল। বাজী পোড়ানো এখন বন্ধ হয়েছে। সাঁওতালরা কেউ বসে আছে, জটলা করছে চুপি চুপি। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। রামেশ্বর দালানের সিঁড়ির ওপরে বসে আছেন তাঁর কয়েকজন সমবয়স্কের সঙ্গে। পিসিমা স্বর্ণলতা পূজোর কাছে। আরও কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাগজ আর কাঠি জ্বালাচ্ছে। বাজি ফুরিয়ে গিয়েছে। ঢাকীরা জাগ্রত প্রহরীর মতো

পূজামণ্ডপের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। নির্দেশ পেলেই ডগর তুলবে। বলির পশুগুলি চোয়াল নেড়ে নেড়ে রোমন্থন করছে, অবাক চোখে দেখছে চারদিকে।

বিদ্যুৎ আস্তে আস্তে ঠাকুরদালানের পাশ দিয়ে মন্দিরের পিছনে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে ঘরের আভাস ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ চীৎকার শুনে থামল বিদ্যুৎ। সামনের ঘরের ভিতর থেকেই শব্দটা এসেছে। দরজাটা এখন ভেজানো। এবং চীৎকারটা লকার গলার নিশ্চিত। ডোমন চক্রবর্তীর সঙ্গে মারামারি করছে নাকি? বিদ্যুৎ কি যাবে? দুজনেই পুরোপুরি নেশাচ্ছন্ন। ওরা মারামারি করে মরে গেলেও কিছুই যায় আসে না বিদ্যুতের। তবু সে দাওয়ায় উঠে এল। দরজায় হাত দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

—কে? কে?

ডোমন চীৎকার করে উঠলেন। আর তাঁর গলা ছাপিয়ে লকা চীৎকার করে বলল, কলকাতার দাদাবাবু।

—অ।....

বিদ্যুৎ ভয় পেল, ডোমন হয়তো তাকে ধমকে উঠবেন। চলে যেতে বলবেন। কিন্তু তিনি হাসলেন। তাঁর মুখ আরো বড়, আরো লাল হয়েছে। সম্পূর্ণ খালি গা। বোধহয় ঘামছেন। উপবীতটি লেপটে আছে গায়ে। বললেন, আস বাবা, বস।

বিদ্যুৎ বসতে গিয়ে অবাক হল। চেয়ারে একজন সাহেব বসে আছেন। নিশ্চয়ই পাদ্রী। মুখে তাম্রাভ দাড়ি। হোলি ক্যাসক তার গায়ে। কিন্তু বোতামগুলি খোলা। ধবধবে শাদা বুকটি খোলা। মুখটি রক্তাভ আর ধূসর চুল, ডোমন চক্রবর্তীর মতোই। ক্যাসক-এর হাতা গুটানো, মণিবন্ধে ঘড়ি। এ দেশের রক্ত নয়, তা বোঝা যায়। চোখ লাল, উজ্জ্বল ধূসর মণি দুটি চকচক করছে। জুতো খুলে পা গুটিয়ে বসেছেন সাহেব। টেবিলের ওপর মদের পাত্র। দুটি পাত্র। নিশ্চয়ই ডোমন আর সাহেবের।

ডোমন বললেন, বস বাবা, বস ক্যানে। ই আমাদিগের রবিশন সাহেব, মায়ু চুয়ার মিশনারি।

রবিনসন হাত টেনে ধরলেন বিদ্যুতের। ঠিক ডোমনের মতোই বললেন বস, বস ক্যানে বাবা। ভগবান ,তুমার মঙ্গল করবেক। আমি মাহুচুয়ার রবিনসন। ডুমন আমাকে রবিশন বুলে, পুরা সানতাল পরগণা বুলে।

রবিনসন হেসে উঠলেন। তাঁর নেশা হয়েছে। বললেন, অই ডুমন ভাই, ই ছেল্যাটা কে?

ডোমন বললেন, আমার কুটুম।

কিন্তু ডোমন যেন হাঁপাচ্ছেন। লকা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার রক্তাভ চোখেও অপলক দৃষ্টি ডোমনের প্রতি নিবদ্ধ। এখন বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে না, কে চীৎকার করেছিল। ডোমন না লকা। দুজনেরই ভাবভঙ্গি ভাল নয়।

ডোমন বসলেন। সকলেই চুপচাপ। বিদ্যুৎ ভাবল, তার উপস্থিতিতে হয়তো সবাই অস্বস্তি বোধ করছে। তাই বোধ হয় এই স্তব্ধতা। সে একটু বিব্রত হয়ে চোখ তুলে দেখল সবাইকে। কিন্তু লকার নত মাথা, ঘাড়-বাঁকানো দৃষ্টিতে ডোমনকে দেখা এবং ডোমনকে শক্ত আড়ষ্ট মাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকা দেখে অন্যরকম মনে হয়। মনে হয়, একটা কি ঘটছিল। এখনও তারই জের চলেছে। রবিনসনের দিকে তাকাল। ধর্মযাজক হাসলেন। হেসে দুজনকেই ইশারায় দেখিয়ে দিলেন। তারপর মাথা নাড়লেন এমনভাবে যেন এই দুটিই পাগল। আর সেই মুহূর্তেই একসঙ্গে কয়েকটা ঢাক বেজে উঠল। তার কাঁপন লাগল মাটির দেয়ালে, টেবিলে, চেয়ারে, পাতার ছাউনিতে।

লকার সেই গোঙানো স্বর শোনা গেল, বড়কত্তা, আপুনি লকার জিভ ছিঁড়্যা লিচ্ছিলেন, আর অখুন লকাকে বলি দিতে চান।

রবিনসন ঠিক ডোমনের মতো বললেন, তু ভগবানের নাম লিয়ে চুপ যা।

কিন্তু লকা তেমনি বলে গেল, এটটো পাঁটা বলি দিলে তার মান্‌সো খেতে পারবেন বড়কত্তা। লকার মান্‌সো খাওয়া যাবেক নাই। কিন্তুক আমার কথাটো মিছা লয়। আমি বুইলছি, রাজসিদ্ধির আজাদিগের হাতে অক্ত নেগেছিল।

রবিনসন বললেন, হুঁ হুঁ, ছিল ছিল।

লকা বলল, পেজার অক্ত।

—হুঁ হুঁ।

—উ-টো পাপ।

—হুঁ হুঁ।

—বাউরিদের অক্ত রাজাসিধি তাবৎ জমিনে।

—হুঁ হুঁ।

—আর সাঁতালিদিগের।

—আরে হুঁ রে, হুঁ।

রবিনসন বারে বারে থামাতে চাইলেন। ডোমন বসে আছেন মুখ ঘুরিয়ে। লকা থামল না। সে বলে উঠল, কিন্তুক পাপটো পাপ।

রবিনসন একটা নিঃশ্বাস ফেলে শব্দ করলেন, অ্যাই অ্যাই।

—তো সায়েব, ই কথাটো বইললে, বড়কত্তা আগ করছেন। আপনকার সামনে, ই মাহাকালী পূজোর আতে বুইলছেন কি, আমাকে বলি দিবেন। ক্যানে, আমি কি মিছা বুইলছি?

রবিনসন জবাব দিলেন না। ডোমন তেমনি চুপ করে বসেছিলেন। লকার কথা থামতেই গেলাস তুলে চুমুক দিলেন। রবিনসন কেও হাত নেড়ে ইসারা করলেন। রবিনসন পাত্র তুলে নিলেন। হয়তো বিদ্যুৎকে দেখেই ডোমন লকার সঙ্গে কথা বাড়াতে চাইছেন না।

কিন্তু লকা চুপ করল না। সে তেমনি গোঙানো স্বরে বলে চলল, কিন্তুক কী হল, আঁ? আমাকে আপুনি কী বলি দিবেন গ বড়কত্তা। আমার জমি নাই, আমি খুঁতে বলি। পাঁটার ভাগ্যি আমার নাই, উয়ার মাঁস সবাই খায়। আমি লেড়িকুত্তা, আমার মাঁস খাবেক কে?

একটা সুদীর্ঘ চুমুকে পাত্র উজাড় করে ফেললেন রবিনসন। টকাস করে গেলাসটা নামিয়ে বললেন, তু চুপ য্যা ক্যানে লকা।

লকার গলা মোটা আর চাপা শোনাল হঠাৎ। বলল, আমি চুপ করতে লারছি গ সায়েব। ক্যানে কী, আমি বুইলছি, কী হল, আঁা? বড়কত্তা। আপনকাদের হাতে পেজাদিগের অক্ত লাগল। কিন্তুক আমি বাউরি, অখুন আমার বুকটো ফেট্যা যেইছে, আঃ।

লকার গলার স্বর যেন কেউ টিপে ধরে মুচড়ে দিল। ভেঙে তলিয়ে গেল স্বর। ডোমন তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে জোরে জোরে মুখ ঘষতে লাগলেন। হঠাৎ ঢাকের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আর এই মূর্ছাহত চিরনিস্তব্ধতার বুকে, অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল লকার চাপা স্বর, বলি তো আনেক হল বড়কত্তা, আমার বুকটো ফেট্যা যেইছে। আপনকার মাথায় খাঁড়া দেখি গ।

রবিনসন যেন শিহরিত গলায় বলে উঠলেন, হে ত্রাণকর্তা।

বিদ্যুতের মনে হল, সহসা একটা অলৌকিক ছায়া বুঝি ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। সে সত্যি সত্যি ডোমনের মাথার দিকে তাকিয়ে দেখল। আর ডোমনের মদের পাত্র ধরা হাতটা যেন কিছুতেই ঠোঁটে পৌঁছুচ্ছে না। থরথর করে কাঁপছে। হাতের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে। যেন প্রাণপণ শক্তিতে গেলাস টেনে তুলতে পারছেন না। এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে টানাটানিতে গেলাসের মদ টলমল করছে। চলকে পডবে হয়তো।

লকার গলা পাছে একেবারে তলিয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় যেন ও প্রায় চীৎকার করে উঠল, অই, আঃ, আমি দেখি, অখুন আজাগুলন বাউরি হয়্যা যেইছে।

লকার গলার স্বর হঠাৎ ডুবে গেল।

ডোমনের পাত্র থেকে মদ চলকে পড়ল। তবু তিনি চুমুক দিলেন। বিদ্যুৎ দেখল, মদ তাঁর কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। জীর্ণ সোনা-মুখের রেখায় রেখায় চুঁইয়ে যাচ্ছে। কারণ গেলাসটা তিনি

একেবারে উপুড় করে ধরেছেন। শ্বাস রুদ্ধ বলেই মুখটা তাঁর ফুলে উঠেছে, আরও বড় দেখাচ্ছে।

রবিনসন হাত তুলে বলে উঠলেন, ভগবান তুমার সহায় হোক লকা।

স্বরহীন মোটা গলায় উচ্চারণ করল লকা, ভগবান আমার সহায় হবে। একটু থেমে আবার বলল, আমাকে আপুনি বলি দিবেন গ বড়কত্তা! তো ইটো বুলেন কি, কোন পাপে বাজাসিধির বড় তরফ ডিকরির ভয়ে কাঁপছে। আমি আপনকার ডর আর চখ মেল্যা দেখতে লারছি।

ডোমন এতক্ষণে মুখ খুললেন আবার। মাথা নত রেখেই অর্ধস্ফুট গলায় বললেন, চুপ কর।

—ওই শালো চোর না চামার নানকুলালের ভয়ে আপুনি জবাইয়ের মুরগীর মতন আকুপাকু করছেন, তো আমাকে—

—চুপ!

ক্রোধ নয়, আর্তস্বরে ডুকরে উঠলেন প্রায় ডোমন। চুপি চুপি গলায় বার বার বলতে লাগলেন, চুপ চুপ চুপ চুপ।

লকা চুপ করল। ভাবলেশহীন রক্তাভ চোখ তুলে একবার দেখল ডোমনকে। তার মাথা নীচু করে, পিছনের ঘরে চলে গেল। রবিনসন ডোমনের কাঁধে হাত রাখলেন। ডোমন মুখ তুললেন। তাঁর কাঁধের ওপর রাখা রবিনসনের হাতের ওপর নিজের হাত রেখে চাপ দিলেন। চোখে চোখে তাকিয়ে দুজনেই হাসলেন। বিদ্যুতের মনে হল, গভীর বন্ধুত্ব এবং প্রেম উপচে পড়ছে দুজনের দৃষ্টিতে ও হাসিতে। এ সবই মাতালের মাতলামি কি না কে জানে। কিন্তু তার মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় ও করুণার বাষ্প জমে উঠল। সে উঠে চলে যাবার মনস্থ করল। অথচ উঠতে পারল না।

রবিনসন বললেন, ডুমন, ভগবান তুমাকে মুক্তি দিবেন।

ডোমন ঘাড় নেড়ে বললেন, হুঁ হুঁ।

রবিনসন আবার বললেন, মনটো বেজায় খারাপ লাগছে হে ডুমন ভাই। আমি দরিদ্র যাজক—

—আঃ! ই তুমি কী বুলছ রবিশন। অই লকা।

—যেইছি।

পাশের ঘর থেকে লকা বেরিয়ে এল। তার হাতে মাটির জাগ্। এমন পোড়া মাটির জাগ্ আর কখনো দেখেনি বিদ্যুৎ।

ডোমন বললেন, দে, দে ক্যানে।

লকা সেই জাগ্ থেকে মদ ঢেলে দিল দুজনের পাত্রে। আর সেই মুহূর্তেই যেন বিদ্যুৎকে নতুন করে চোখে পড়ল ডোমনের। বলে উঠলেন, অ! আই যে বাবা, হঁ, আরে অই লকা, তুর কি তনজ্ঞান নাই, অঁা? আমাদিগে দিচ্ছিস, দাদাবাবুকে দে। যা যা, একটা গেলাস লিয়ে আয়, দে, দে।

অবাক হল বিদ্যুৎ। কী দিতে বলছেন তাকে ডোমন! মদ! অবিশ্বাস্য। সে কী বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই লকা বলে উঠল, আপনকার কুটুম, কলকেতা থিক্যা আসছেন, আপুনি কিছু বুলছেন নাই বড়কত্তা, তাই দিচ্ছি নাই।

—ই আবার বলাবলির কী আছে গাধা! আমাদিগের বাজবাহিনীর দেশে, কালীপুজোর রাতে কারণে কোন নিষেধ নাই। ইষ্টিকুটুমকে আগে দিতে লাগে, নইলে দেবীর কোপ হয়।

বিদ্যুৎ ভাবল, ডোমন মাতাল হয়ে গেছেন কিংবা বিদ্যুৎ এখানে বসে আছে দেখেই হয় তো উনি ধরে নিয়েছেন, পান করবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে লজ্জায় বলতে পারছে না। বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি বলল, না না, আমি—

ডোমন বলে উঠলেন, অভ্যেস নাই বুইলছ তো বাবা? তাই কখুনো থাকে? ই অভ্যেস কোন দুঃখে করবে বাবা। সোনার চাঁদ ছেল্যা তুমুরা। কিন্তুক আজকের রাতে উটো পাপ নয়, দেবীর তুষ্টিবিধেন হয়। একটুক মুখে দাও। তুমার বাবা কাছে থাকলে উঁয়াকেও খাওয়াতুম। রাগ করো না, ঘেন্না করো না বাবা। তুমি লেখাপড়া-জানা ছেল্যা, তুমাকে আমি কী বোঝাব। উতে আজ পুণ্যি হয়, এইটো জানবা।

লকা ততক্ষণে পাত্র পূর্ণ করে বসিয়ে দিয়েছে সামনে। আর বিদ্যুৎ ভাবছে, লেখাপড়া জানা না থাকলে কী বোঝাতেন ডোমন, সেইটাই শুনলে হত। আজকের এই অমাবস্যা রাত্রে মদ্যপানের সঙ্গে দেহবিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাতেন নাকি? নাকি অতীন্দ্রিয়লোকে পৌঁছুবার কোনো গূঢ় বিষয়ের কথা বলতেন?

ডোমন তখন রবিনসনের দিকে ঝুঁকেছেন। বলছেন, বড় ভাল ছেল্যা, বি. এ পাশ।

রবিনসন ঘাড নেড়ে বলে উঠলেন, বা বা! বাহ্‌বা!

হাত বাড়িয়ে, বিদ্যুতের হাত ধরে ঝাকানি দিলেন। বললেন, পিও বাবা, পান কর। ই দ্যাখ ক্যান, ডুমন আমার ছেল্যাবেলার বন্ধু, তো আমি আজ চাল্লিশ বছর ধর‍্যা কি বছর ই রাতটোতে উঁয়ার সাথে না বসে পারি না। পাপ হলে ভগবান বিচার করবেন। ডুমনের বাপের সাথে আমার বাপও যেত।

লকা বলে উঠল, হঁ, সাযেবটো বছরে দুদিন ওঁয়ার ঠাকুরের অক্ত খায়।

খবর্দার লকা!

রবিনসন সহসা চীৎকার করে, ঘাড় বাঁকিয়ে লকার দিকে ফিরলেন। তাঁর মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। তাম্রাভ দাড়ি কাঁপতে লাগল। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ডোমনও দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে উঠলেন, চোপরাও শুয়ার। মুখ ছিঁড়ে ফেলব তুর আজ।

ডোমন এগিয়ে আসছিলেন। রবিনসনই আবার ডোমনকে হাত দিয়ে আটকালেন। বললেন, থাক, উঁয়াকে ক্ষমা কর ডুমন ভাই। বস, বস।

ডোমনের চোখ এবার সত্যি ক্রুদ্ধ হিংস্রতায় দপদপ করছে। বিদ্যুৎ তখনও ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি। কী ঘটল এমন গুরুতর, ধরতে পারেনি। কিন্তু বিশেষ একটা কিছু ঘটে গেল, বুঝতে পারছে লকার ভাব দেখে। প্রতিবাদের কোন লক্ষণ নেই লকার ভাবে ভঙ্গিতে। যেন বোকা বনে থমকে গিয়েছে। মাটির

জাগ্‌টা কলসীর মতো কাঁকালে নিয়ে রবিনসনের দিকে তাকিয়ে রইল। এবং ডোমনের কথানুযায়ী, অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত শুয়োরের মতোই তার দৃষ্টি।

—রবিনসন বললেন, ই দ্যাখ লকা, যা বুঝিস না, তা বুলিস নাই।

লকা রবিনসনের দিকে চোখ রেখে, পায়ে পায়ে পাশের ঘরের দিকে একটু গিয়ে দাঁড়াল। মোটা একঘেয়ে গলায় বলল, আমার অল্যায় হয়েছে ঠাকুর সায়েব।

ডোমন বলে উঠলেন, হুঁ, হয়েছে।

লকা হঠাৎ বসে, মাটিতে হাত ঠেকিয়ে বলল, তো আমাকে মাপ করেন।

রবিনসন বললেন, ভগবান তুমাকে ক্ষমা করবেন।

লকা বলল, হুঁ—। কিন্তু আপনকার আশ্রমে যে বাঙালী সায়েবটো আছেন, উনি আমাকে বুইলছেন কি, বছরে একদিন্ আপুনি মদ খান, আর উ মদটো আপনকার দেবতার অক্ত।

রবিনসন ঘাড় নেড়ে বললেন, হুঁ, উটো আমার পরব আছে।

বিদ্যুতের আবছাভাবে মনে পড়ল, সম্ভবতঃ খ্রীস্টানরা তাঁদের ইস্টার পরবে, যীশুর পুনরভ্যুত্থানের উৎসবে রুটি আর মদ খ্রীস্টের রক্ত মাংস তুল্য গ্রহণ করে।

রবিনসন বললেন, কিন্তুক ইটো আমার উ পরব লয়। ইটো আমার দোস্তের পরবে সামাজিক ক্রিয়া আছে।

—তো আমাকে মাপ কর‍্যা দেন গ সায়েব।

—ভগবান তুমাকে মাপ করবেন।

—আই! রাজাসিধিতে অখুন মা কালী এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি তিন চখে সব দেখছেন। অ্যাই গ মা, আমার অল্যায়টা তুমি বিচার কর।

বলে লকা ওপরের দিকে তাকাল। রবিনসন হঠাৎ ঘাড়ে আঙুল ছুঁইয়ে, অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, আমেন!

লকা তেমনি ওপরে চোখ রেখে বলল, অই গ মা, তুমার চখে সব

পাপ ধরা পড়বেক গ। লকার অন্যায় হলে তুমি দেখবে। সবার বিচার তুমি করবে।

লকা যেন সত্যি সত্যি কারুর সঙ্গে কথা বলছে চালের দি:ক তাকিয়ে। রবিনসনও একবার তাকালেন ওপরের দিকে বললেন তু চুপ কর লকা।

ডোমনও বললেন, হঁ, তু চুপ কর।

বিদ্যুতের মনে হল, রবিনসন যেন কেমন একটু অস্বস্তি বে ধ করছেন। আবার একটা স্তব্ধতা নেমে এল। অস্বস্তিকর স্তব্ধত । লকা আস্তে আস্তে উঠে দেয়ালের দিকে সরে গেল। তার ভঙ্গির মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ মন্ত্রোচ্চারণ এব ক্রিয়ার ভাব ফুটে উঠল

ডোমন বললেন, খাও খাও রবিশন।

রবিনসন বললেন, হঁ, মা কালীর নাম নিয়ে।

ডোমন ঘাড় নেড়ে বললেন, হঁ হঁ, খাও বাবা. তুমি খাও।

বিদ্যুৎকে বললেন, ডোমন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বিদ্যুৎ প ত্র তুলে নিল। ওঁরা দুজনেই চুমুক দিলেন। তিক্ত ঝাঁজের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত কিছু নেমে যেতে লাগল পেটের মধ্যে একেবারে অচেনা স্বাদ নয় এটা বিদ্যুতের কাছে। কিন্তু এতটা তিক্ত ও ঝাঁজ তার জানা ছিল না। এক চুমুকেই মনে হল. মুখের ভিতরটা গরম হয়ে উঠল। ভেজানো দরজার দিকে দেখল সে। আভা দেখছে না তো দেখলে কী ভাববে? হয় তো বলবে, 'খেলেনই যদি, গোলাবাড়িতে মেয়ে-জামাইদের আসরেই খেলে পারতেন। আমি তো আপনাকে সেই জন্যই ওখানে নিয়ে গেছলাম, যদি আপনার ইচ্ছা করে।' হয়তো আভা এসব কথা বলত না। কিন্তু বিদ্যুতের এই রকম মনে হচ্ছে। কেন কে জানে। সত্যি খেলামই যদি, তা হলে গোলাবাড়ির সেই আশ্চর্য রঙমহলে—। ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই যেন আবার চুমুক দিল পাত্রে। গা-টা ঘুলিয়ে উঠল, শরীরটা শিউরে কেঁপে উঠল। কেউ লক্ষ্য করল না। চুমুকটা বোধহয় বড় হয়ে গিয়েছিল। অনেকখানি চলে গিয়েছে। পেটের মধ্যে জ্বালা করে

উঠল একটু। আর অস্পষ্ট অনুভূত হল, খুব ধীরে ধীরে দেহে একটা কী ক্রিয়া ঘটছে। সহসা, গোলাবাড়ির মরাইয়ের ধারে অন্ধকারে সেই হাসির এবং অন্যান্য শব্দ তার মনে পড়ল। আর আভার কাঁধের স্পর্শ, হাতের স্পর্শ, চুলের গন্ধ, গোলাবাড়ির মেয়েদের বিস্রস্ত বেশবাস, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। এই সব যেন তার ভিতরের একটা গর্ত থেকে পিলপিল করে উঠে এল। সে আবার দরজার দিকে তাকাল। সত্যি আভা আসেনি। অথচ আভার চোখ দুটি আবার ভেসে উঠছে সামনে।

সে তৃতীয়বার চুমুক দিল। দাঁতে দাঁত চেপে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। তারপর মনে মনে বলল, ক্ষতি কী! সেই কাল বিকেলের ঝোঁকে, বিসর্জনের সময়ে আমার সিদ্ধবস্তু সংগ্রহ করতে হবে। সময় অনেক আছে হাতে। নেশা যদি একটু হয়, হবে। সময় কাটবে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত হবে না বিদ্যুৎ। আগামীকাল বিকেল অবধি কোনো রকমে সময়টা কাটানো। তারপরেই সিদ্ধবস্তু নিয়ে রাত্রের গাড়িতে কলকাতা।

সে আবার ডোমন আর রবিনসনের কথায় মনোযোগ দিতে চেষ্টা করল। লক্ষ্য করল, লকা দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে তেমনি তাকিয়ে আছে।

রবিনসন বললেন, জানি, তুমাদিগের পূর্বপুরুষের কথা আমি সব জানি। তুমাকে দিয়ে ক্যানে আমি রাজাদিগের বিচার করব ভাই। আমার বাবার মুখে শুনেছি বাজসিদ্ধির রাজারা কত দান করেছে। আবার শক্ত হাতে প্রজা পালন করত।

লকা যেন চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল, হুঁ, আর তুমার বাবা মিশনারিটো মজা লুটত।

আলোচনা কোথা থেকে কোথায় গড়িয়েছে, খেয়াল করেনি বিদ্যুৎ। কিন্তু আবার একটা আসন্ন উত্তেজিত ঘটনার গন্ধ পেল সে কারণ লকা আবার মুখ খুলেছে। আর লকা যেন দু-মুখো করাত সবাইকে কাটতে চায়।

রবিনসন ঘাড় নেড়ে বললেন, না না, ইটো ঠিক লয়। আমার বাবা ধার্মিক ছিলেন।

লকা আঘাতোদ্যত ষাঁড়ের মতো ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আর সি ধাম্মিক আজাদিগের ভায়ে ভায়ে লড়িয়ে দিত. ধম্মের নামে জমি লিত। লয় তো বেনামীতে কিনত।

—আই, আরে হারামজাদা— !

ডোমন চীৎকার করে উঠে গেলাসের মদ সব ছলাৎ করে লকার গায়ে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, তু চুপ করবি, আঁ? করবি?

লকার বুকে পেটে বেয়ে টপ টপ করে মদ পড়তে লাগল মাটিতে। খানিকটা দেয়ালেও ছিটকে লাগল। লকা বলল, করব। সায়েবকে কি আমি খারাপ বুইলছি। সত্যি কথা বুইলব না?

ডোমন চীৎকার করে বললেন, না। সত্যি মিথ্যা কিছু শুনতে চাই না।

—তো আমি যাই গা। আমি পুজো-দালানে যেইছি।

—যা যা, তাই যেইয়ে মর গা যা।

লকা এমন ভাবে সরে এল, যেন সে দরজার দিকেই যাবে। কিন্তু সে টেবিলের সামনে এসে ডোমনেরই খালি গেলাসটা পূর্ণ করে দিতে লাগল। ভরে ওঠবার আগেই গেলাস সরিয়ে নিলেন ডোমন। বললেন, যা যা, তু যা গা ইখান থিক্যা।

লকা গেল না। রবিনসনের দিকে ফিরে বলল সায়েব, আপনকার সাথে কি আমার বিবাদ আছে?'

—না।

—তো? আপনকারা মাহুচুয়ায় কত ভাল ভাল রাস্তাঘাট করেছেন, আঁ?

—হুঁ।

—আপনকারা সাঁতাল বাউরির ছেল্যা-মেয়্যাদের নেকাপড়ি শিখাচ্ছেন।

—হুঁ।

—মাহুচুয়ার লাটটো আপনকাদের।

—মিশনের।

—হুঁ। আগে আজাদিগের ছিল।

—ছিল।

—তো আপনকার পায়ে গড় করি গ সায়েব, একবার দলিলটো খুল্যে দেখবেন, আমি মিছা বলি নাই, উতে ধম্ম নাই।

ডোমন ধমকে উঠলেন, না, দেখবে নাই। তু যাবি-?

লকা পেছিয়ে গেল মাথা নত করে। রবিনসন বললেন, কিন্তুক অধর্ম করলে ভগবান কাউকে ক্ষমা করবেন নাই লকা। আমাকেও না।

লকা বলল, সি কথাটো বুলি নাই সায়েব। আমি খালি মাহুচুয় লাটের কথা বুইলচি। আপনি তো মাহা পুণ্যিমান গ।

রবিনসন কথায় শান্ত, কিন্তু তাঁর মুখে উত্তেজনা। বললেন, আমার পুণ্যি আমি জানি নাই। কিন্তুক, পাপটো হল আগুনের সামনে খড়ের পালুই। উকে কেউ বাঁচাতে পারবেক নাই। আমার বাবা হলেও না।

—আই, আই মাপ করেন গ সায়েব।

লকা নীচু হয়ে বসে রবিনসনের পা ধরল। রবিনসন হাসলেন মাথায় হাত দিলেন লকার। বললেন, ভগবান আমাদিগের সহায় হোক। উঠ, উঠ ক্যানে।

ডোমন বললেন, গাধা, তু গাধা লকা। লাও, লাও হে বিদ্যুৎ খাও উটো।

বলে চুমুক দিলেন। লকা পিছন ফিরে জাগ উপুড় করে গলায় ঢালল।

এমন সময়ে ঢাক বেজে উঠল আবার। রবিনসন আবার চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, মা কালীর নাম লিয়ে হে ডুমন! হে ডুমন!

—হু হু।

লকা জাগ্ শুদ্ধ হাতটা উঁচুতে তুলে, ঢাকের তালে নেচে উঠল বেসুরো হেঁড়ে গলায় চীৎকার করে গেয়ে উঠল,

অ মা পাপনাশিনী পাপ নাশ' গ মা
এ পাপের কালি খেয়ে মা তুই হলি শ্যামা।

রবিনসনও উঠে দাঁড়ালেন। দু হাতে গেলাস উঁচুতে তুলে তিনিও সুর করে বললেন,

অ মা পাপনাশিনী পাপ নাশ' গ মা !

ডোমন বিছানাতের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, নিশা হয়্যা গেল্‌ছে। বলে সস্নেহে একবার রবিনসনের দিকে দেখলেন। রবিনসন তখন লকার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছেন,

আয় মা খাঁড়া তুলে বসন ফেলে ·।

ডোমন আবার বললেন, উয়ারা আমাদিগের অনেক ক্ষেতি করেছে বাবা, কিন্তুক উয়াদের দোষ দিতে পারি না। আমার ছেল্যা যদি আমাকে বাপ না বুলে আর কাউকে বাপ বুলে, তো সি দোষটো আমার। প্রজারা যদিন্ মিশনারিদের কাছকে চল্যা যায়, সব সপ্যা দেয়, আইনের গোলমাল না করে, তো কার কি বুলবার আছে, আঁ ! কিছু নাই। তো, দুঃখ্ লাগে বাবা, যখুন দেখি, সাঁতালিদের উয়ারা কালা সাহেব-মেম বানাতে চায়। যেন সাঁতালি কেরেস্তানরা ই দেশের মানুষ লয়। ক্যানে, উয়াদের কি তুমি বিলাত লিয়ে যাবে হে ? উয়ারা পাতলুন পরে, ইংরাজী বুলে, দেখে মনে ল্যায় কি উয়ারা সাঁতালি নয়। আমাদিগের শত্রু মনে করে। ক্যানে ? রবিনসন বুলে, 'উ তুমার বুঝবার ভুল আছে ডুমন।' হবেক বা। আমার আপন ভাগ্না নিতাইলাল প্রজা ক্ষেপিয়ে বেড়াত। বুলত, বেগার খাটব নাই, পুরা মজুরি না দিলে চাষ করব নাই ··।' কত কী ! কলকাতার কলেজে লিখাপড়া করে, নিতাই গাঁয়ে এসে উ সব করতে লাগলে। তো কাকে কি বুলব বাবা। নাম একটো ছিল বাজসিদ্ধির জমিদার, লোকে শুনে হাসত। তো উচ্ছেদ হয়েছে, সি দুর্নামটো গেল্‌ছে। অখুন মহাকালের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন ঝোঁকের মাথায় বলে চলেছেন। আবার বললেন, তবে, রবিশন মানুষটো ভাল। ছেল্যাবেলার বন্ধু। বছরে এই রাতটোতে আসে, যায়, তো তাতে উয়াদের মিশনের লোকেরা উয়ার পরে খুব রাগ করে। কিন্তুক, মানে না। উ বলে—

হঠাৎ ঢাকের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আর ডোমন চমকে উঠে, দরজার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। লকা আর রবিনসনের

হাতে হাত ধরা। ঢাকের শব্দ থেমে যেতে, তারাও সহসা চুপ করে গেল। লকা ফিরে তাকাল ডোমনের দিকে।

ডোমন অস্ফুটে ডাকলেন, লকা!

লকা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। বলল, হুঁ, গরুর গাড়ির শব্দ।

বিদ্যুৎ শুনতে পেল গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ। সাপের মুখে পড়ে ব্যাঙ যেমন ফুলে ফুলে আর্তনাদ করে, সেই রকম চাপা আর্তবিকৃত স্বর বাজছে গরুর গাড়ির চাকায়, আর এগিয়ে আসছে শব্দটা। ডোমন তাকিয়ে আছেন লকার দিকে। লকাও। দুজনেই যেন সম্মোহিত। রবিনসনও স্তব্ধ নিশ্চল।

এবার সামনেই গাড়োয়ানের গলা শোনা গেল, র, র।

পরমুহূর্তেই ঠকাস করে শব্দ হল। আর বলদেরই নিঃশ্বাস ফোঁস করে উঠল বোধহয় বাইরে।

ডোমন আবার অস্ফুটে ডেকে উঠলেন, লকা!

লকা রবিনসনের হাত ছাড়িয়ে ডোমনের কাছে এগিয়ে গেল। বলল, উতলা হবেন নাই বড়কত্তা। উতলা হবেন নাই। বাজবাহিনীর নাম ল্যান।

অর্থাৎ দেবী বাজবাহিনীর। লকা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আর তৎক্ষণাৎ বাইরে একটা মোটা ফ্যাসফেসে গলা শোনা গেল, ডোমনবাবু! আছেন কী?

কথা শেষ হবার আগেই লকা দরজা খুলে দিল। ঘরের বদ্ধ আলো ছিটকে পড়ল বাইরে। বিদ্যুৎ দেখল, একটা লোক। ডোমনের মুখখানি সহসা বদলে গেল। রেখাগুলি আরও গভীর হল, ঘন হল। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে লকাকে সরিয়ে দিলেন। অভ্যর্থনার সুরে, হাত জোড় করে বলে উঠলেন, আসেন আসেন গ বাবুসাহেব। আপনকার জন্যে বস্যা রইচি, আসেন।

লোকটা বলে উঠল, বটে বটে!

বলতে বলতে লোকটা ডোমনকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢুকল। পাকানো গোঁফ, কদমছাঁট চুল আর মোটা কাপড়ের লম্বা পাঞ্জাবিতে

লোকটাকে দশাশয়ী দেখাচ্ছে। ঈষৎ টলায়মান। তাম্বুল-রঞ্জিত পুরু ঠোঁটে হাসির আভাস। লোকটা ক্ষ্যাপা মোষের মতো ঢুকল। ঢুকে চারদিকে একবার দেখে নিল। পাশের ঘরেও উঁকি দিল একবার।

ডোমন বললেন, এত দেরী হল?

লোকটা হাত উল্টে বলল, পুলিশ সাহাবের গাড়িতে মাহুচুয়া আসলাম। খুব দিওয়ালি জমেছে সেখানে। শালা রাতটাই কাবার করে দিলে।

লোকটার কথায় বেহারি টান শুনে বিদ্যুতের বুঝতে অসুবিধা হল না, এ সেই নানকুলাল মহাজন। সে আবার বলল, পূজাপাট তো বহুত জমেছে ডোমনবাবু।

—আপনকার দশজনের দয়া। আ রে, আই লকা, বাবুসাহেবকে—

লকা তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে মাটির জাগ্ আর গেলাস নিয়ে এল। নানকুলাল বলে উঠল, ঘরে চোলাই মাল? দিশি? পারব কি টানতে? আরে দাদা, পান শো টাকার মাল কিনে তো খালি কর্তাদেরই দিলাম। নিজেও টেনেছি খুব। কিন্তুক নিশা হবার নাম নাই। তো—ইয়ে, মানে, এই মাল তো সেই অওরতটা বানিয়েছে। কী ওর নাম?

—সোনা। লকা স্বরহীন গলায় বলল।

—হাঁ হাঁ, সোনা। তো দে দে, দে রে লকা।

লকা মদ ঢালতে ঢালতে বলল, এ মদে একেবারে অবশ্য নিশা হবেক।

—হাঁ, অওরতটার নামে কামে, সব কিছুতে নিশা আছে।

গেলাস নিয়ে চুমুক দিল নানকুলাল। মুখটা বিকৃত করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। রবিনসনের দিকে ফিরে বলল, সাহেব কখুন আসলেন বটে?

রবিনসন শান্ত আর বিমর্ষ হয়ে উঠেছেন খানিকটা। বললেন, অনেকক্ষণ। বস ক্যানে নানকুলাল।

—না, বসব নাই দাদা। তবিয়তটো ভাল নাই। অখুন নিদ যাব।

গেলাসে দ্রুত চুমুক দিয়ে ঘরের চারদিকে তাকাল নানকুলাল।

ডোমন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, হঁ হঁ, আপনকার ঘর-বিছানা? সব ঠিক আছে। কিন্তুক, আপুনি যে বলি দেখবেন বুলেছিলেন? সময় হয়্যা এল, বলি দেখবেন নাই?

—ধু-র মোশাই, উ সব দেখে কী হবে। উ সব খুনখারাবীর মধ্যে আমি নাই। আপনাদের সেই—

—হঁ হঁ, আপুনিকে সে লিয়ে যাবে ঘরে। কই রে লকা, উ কুথা?

ডোমনের গলায় উত্তেজনা আছে, কিন্তু আন্তরিকতা নেই। স্বরহীন গলায় একটা অসহায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উত্তেজনায় বরং অন্যমনস্ক লাগছে ওঁকে। লকা কেমন উদাস হয়ে গিয়েছে। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডোমনের কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজন মনে করছে না যেন।

কিন্তু দরজায় একটা মূর্তি ভেসে উঠল। বিদ্যুৎ দেখল সোনা। সেই সোনা-ই। অথচ অন্যরকম লাগছে। মুখখানি যেন ঈষৎ লম্বা দেখাচ্ছে এখন। ওর মুখ চকচক করছে। কিছু মেখেছে, না কি নিশা করেছে, বুঝতে পারছে না বিদ্যুৎ। নাসারন্ধ্র স্ফীত, নাকছাবি চিক্‌চিক্ করছে। পান খাওয়া ঠোঁটে ঠোঁট টেপা। কানে ঝালর-দেওয়া রুপোর দুটি বড় বড় অলঙ্কার দুলছে। চোখে হয় তো কাজল মেখেছে। কারণ চোখ দুটি আরও বড় দেখাচ্ছে এখন। আর লাল শাড়ি, টকটকে লাল শাড়ি পরেছে সোনা। কালো মেয়ে, লাল শাড়ি, এমন একটা ভয়ংকর রং-এর সংমিশ্রণ যেন কখনো দেখেনি বিদ্যুৎ। এ রকম রূপ দেখে স্বস্তি হয় না, ত্রাসের ছায়া পড়ে মনে।

সোনার দিকে তাকিয়ে, সেই ত্রাসেরই ছায়া পড়ল যেন ডোমনের চোখে। দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন তিনি। ঠোঁট নড়ে উঠল। কিন্তু কথা শোনা গেল না। মাথা নত করল সোনা। বিদ্যুতের মনে হল, তার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে।

নানকুলাল লুব্ধ মাতাল চোখে সোনাকে দেখল। আর বিদ্যুতের চোখেও মদের নেশা রয়েছে বলেই সে যেন দেখল, পাথরের অসমতল

কঠিন ধরিত্রীর মতো সোনার সর্বাঙ্গে একটা বলিষ্ঠ ঔদ্ধত্য। এ কি সোনার কারচুপি, না বাউরি মেয়ের সংক্ষিপ্ত সহজ ছন্দ, বুঝতে পারল না। কপালে ওর যুগল লাল-টিপ মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো দপ্‌দপ করছে।

সহসা ক্রুশ করতে করতে রবিনসন অস্ফুটে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, কে উটো?

লকা বলল, সোনা।

—অ!

রবিনসন বললেন, আঃ! আই, ডুমন সত্যি বলছি, আমি মনে করলাম কি, তুমার ঠাকুর-দালান থিকা প্রতিমাটা কাপড় জড়ায়ে এসে দাঁড়ালে।

—চুপ, চুপ, রবিশন ভাই।

ডোমন যেন ভয়ে শিউরে উঠলেন। সোনা একবার চোখ তুলে ঘরের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পিছন ফিরে পায়ে পায়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

ডোমন নানকুলালকে বললেন, চলেন, বিশ্রাম করবেন, আপুনিকে পিছনের ঘরে রেখ্যা আসি।

লকা বলে উঠল, বাবুসাহেবের কাছ থিক্যা আসল কথাটা শুনলেন নাই বড়কত্তা?

নানকুলাল পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ডোমন উৎকণ্ঠিত শঙ্কায় বলে উঠল, যাক, এখন যাক, কাল শোনা যাবে।

মণ্ডপে ঢাক বেজে উঠল এই সময়ে। একটা তীক্ষ্ণ ঝন্‌ঝনায় ডগর দিয়ে বেজে উঠল।

নানকুলাল গলা তুলে বলল, হাঁ, ঠিক কথা। আসল কথাটা বলা দরকার ডোমনবাবু, আপনার শেষরক্ষা হবার আশা নাই। আমি কী করব। আপনি মাথার বেবাক চুলগুলা ইস্তক বিকিয়ে রেখেছেন। যে-দলিলে হাত দিই, তা-ই গড়বড়। একটা উকীলকে মাসকাবারি খাওয়াচ্ছেন, সে আপনার একটা পরচার খবর ইস্তক রাখে না।

আপনি খাতক আছেন, আমি মহাজন আছি। আমি আখেরি তক চেষ্টা করেছি, আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না।

বিদ্যুৎ অবাক হয়ে দেখল, ডোমন বিনীত ভাবে মাথা নেড়ে একটু একটু হাসছেন। কিন্তু দৃষ্টি সম্পূর্ণ অর্থহীন। বলছেন, তা তো বটে! বটে!

নানকুলাল দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল। লকা বলে উঠল, তো আপনকার কেরামতি মোদ্দা কী দাঁড়ালে বাবুসাহেব?

নানকু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। লকাকে দেখে ডোমনকে বলল, লোকটার দেমাক ভারি সাফ। আসল কথাটা বলেছে। তো ডোমনবাবু, আপনাদের অনেক পয়সা খেয়েছি, ঝুটা বলব না। এখন সরকার আমার হাতে সব তুলে দিচ্ছে, আমি না নিলে দোসরা কেউ নিবে। আপনি তো নিতে পারবেন নাই। কিন্তুক নানকুলালের জবান, আপনি যত দিন জিন্দা আছেন, ততদিন সব আপনার ভোগদখলে থাকবে। আপনার খাজনা ইস্তক মাপ।

বলে সে বেরিয়ে গেল। লকা বলে উঠল, কিন্তুক—

—চুপ। নানকু আমার অতিথি।

ডোমন হাত তুলে লকাকে থামিয়ে, নানকুলালের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। লকা চুপ করেই রইল। তাকিয়ে রইল দরজার দিকে। এই প্রথম দেখা গেল, লকা একেবারে চুপচাপ। রবিনসন দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে, মাথা নত করে বসে আছেন। কেবল বিদ্যুতের মনে হল, সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, কী ঘটে গেল। সে বুঝতে পারছে না, এখন সে কী করবে। তার কেবল একটা কথাই মনে আছে, কাল সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু এখন কলকাতার থেকেও ভয়ংকর আর জটিল মনে হচ্ছে এই বাজসিদ্ধিকে। এখানে তার আর একটা মুহূর্তও কাটতে চাইছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। কলকাতার থেকেও এই দূর গ্রাম বাজসিদ্ধি আরও অনেক বড় একটা শ্বাসরুদ্ধ বীভৎস নরক। একটা অলৌকিক ভয় এবং অস্বস্তি ক্রমেই ঘিরে ধরছে তাকে। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরুনো দরকার।

ভাবতে ভাবতেই, বিদ্যুৎ অন্যমনস্ক উত্তেজনায় মদের গ্লাস তুলে চুমুক দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, ঢাকের শব্দ ছাপিয়ে, মোটা স্বরে আর্ত পশুর চীৎকার ভেসে এল। মহিষের চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উন্মত্ত হাসির খলখল ধ্বনি উঠল। তারপরেই সারা বাজ-সিদ্ধির আকাশ ভরে শত শত ছাগ-শিশুর চীৎকার ধ্বনিত হল। লকা বলে উঠল, জয় মা ! জয় মা কালী !

রবিনসন সুপ্তোত্থিতের মতো সোজা হয়ে বসে ক্রশ করলেন। অস্ফুটে বলে উঠলেন, ও গড।

লকা আপন মনে বলে উঠল, রাত শেষ হয়্যা এল। উয়াদের চান করাতে লিয়ে যেইছে।

বলির পশুদের কথা বলছে সে। পশুদের শুদ্ধ করাবার জন্য শেষ-স্নান করাতে নিয়ে চলেছে। পশুগুলি কী বুঝছে, কে জানে। ওরা চীৎকার করছে। ওদের বুদ্ধি নেই, প্রবৃত্তি আছে। ওদের সেই প্রবৃত্তির ভিতরে কোথাও কি মৃত্যুর পদক্ষেপ ধ্বনিত হচ্ছে ? কিন্তু মানুষের এত উল্লসিত রোল কিসের ? পশুর আর্ত চীৎকারের সঙ্গে মানুষের অট্টহাসি বাজছে কেন ?

বিদ্যুৎ বেরিয়ে পড়বে মনে করে উঠে দাঁড়াল। ডোমন ঢুকলেন। বিদ্যুৎ দেখল, ওঁর মুখের রেখাগুলি এখন আর নেই। আশ্চর্য ! যেন স্বর্ণাভ মোম দিয়ে মুখটা কেউ লেপে দিয়েছে ওঁর। মানুষের মুখের এত ঘন ঘন পরিবর্তন হয় কী করে ! চোখ দুটি ভেসে উঠেছে। যেন ভিতর থেকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু মুখে একটু হাসি-হাসি ভাব। হাসি-হাসি ভাব করে বিদ্যুতের দিকে তাকালেন। কথা বললেন না। কেউ কথা বলল না। ডোমন পাশের ঘরে চলে গেলেন। ঢক-ঢক করে কিছু খাচ্ছেন বোঝা গেল। মদ কি ওরকম করে খাওয়া যায় ?

আবার বেরিয়ে এলেন ডোমন। টকটকে লাল দেখাচ্ছে মুখ। প্রতি রোমকূপ দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুবে বুঝি। কিন্তু হাসছেন ডোমন। শান্ত গলাতে বললেন, কই, লকা, গানটো গা ক্যানে ? অ মা পাপ-নাশিনী···। গা রে।

লকা গম্ভীর গলায় বলল, আপনি গান।

ডোমন লকার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ লকার খোলা কালো-কুচকুচে বুকে ওঁর রক্তিম ফর্সা হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। ডাকলেন, লকা!

লকা সরে গেল। যেন স্পর্শ করতে চায় না ডোমনকে। বলল, বড়কত্তা, ডিক্রিটো হয়্যা গেল্‌ছে।

—হুঁ।

—লীলামে উঠে গেল্‌ছে বড়তরফ?

—হুঁ।

—আপনকার ইজ্জতটো—

—চুপ, চুপ, উ কথা বলিস নাই।

ডোমন আবার এগিয়ে গেলেন। লকার গায়ে আবার হাত দিলেন। আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রায় চুপি চুপি বললেন, তুর মনে আছে কি, আমরা ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতাম।

—বড়কত্তা!

লকা চীৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু গলা তুলতে পারল না। ডোমন বলে চললেন, অবাক কাণ্ড, দ্যাখ্‌ ক্যানে লকা, আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। অই রবিনসন, তুমার মনে আছে?

—আছে হে ডোমন।

রবিনসন উঠে এলেন। ডোমনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ডোমন আর একটা হাত দিয়ে রবিনসনের হাত ধরলেন। বললেন, আমরা কপাটি খেলতাম, আর গাদি। দম চাই দুটোতেই। কিন্তু কপাটিতে গায়ের জোর, আর গাদিতে বুদ্ধি। গাদিটাই মজার, না?

বিদ্যুৎ আর শুনতে চাইল না। কিন্তু বেরোতে গিয়ে থমকাল। দরজায় আবার সোনা।

ডোমন চমকে উঠে বললেন, উকে যেতে বল লকা। উ ক্যানে ইথ্যানে আসছে?

সোনা বলল, সব লীলাম হয়্যা যেইছে?

ডোমন বললেন, হুঁ হুঁ। উকে যেতে বল। নানকুকে আমি ডেক্যা নিয়ে আসছি।

লকা বলে উঠল, সোনা যেতে চায় না।

ডোমন ধমকে উঠলেন. যাবে, যেতে লাগবে।

বলেই ডোমন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার গলার স্বর খাদে নেমে গেল। ডাকলেন, সোনা !

সোনা তাকিয়েছিল। সম্মোহিতার মতো এগিয়ে এল। ডোমন হাত তুললেন, আস্তে আস্তে স্পর্শ করলেন সোনার কপালে। সোনার মাথা নত হয়ে গেল। চোখের পাতা বুজে গেল।

ডোমন বললেন, নানকু আমাকে শুদ্ধ কিনে নিয়েছে। তু যাবি নাই ?

সোনা চকিতের জন্য একবার মুখ তুলল। বিদ্যুৎ বুঝতে পারল না, সোনার চোখে আগুন, না জল ঝিকমিকিয়ে উঠল নিমেষে দরজার বাইরে অদৃশ্য হল সোনা।

ডোমন আবার ফিরে গেলেন লকার কাছে। কথারই জের টেনে বললেন, হুঁ, কী যেন বলছিলাম—

লকা বলে উঠল, কিছু বুইলবেন না বড়কত্তা ?

—বুইলব।

ডোমন বললেন, আমি বুলচি, লকা, তু আমার ভাই।

—না না।

—হুঁ।

—না। আমি লকা বাউরি।

—তু আমার ভাই। ছেলেবেলায় তু আমাকে ডোমন বুলে ডাকতিস।

—অই, অই বড়কত্তা—

—লকা !

—অখানকার ইজ্জতটো—

—অই, অই রবিশন, তুমি আমার ভাই, লকাকে চুপ যেতে বল হে।

রবিনসন ডোমনের হাত ধরলেন। লকার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, তু চুপ কর লকা।

লকা হঠাৎ আর্তস্বরে বলে উঠল, আমি চুপ করব ? আঃ ! আমার মনটো কেমন করছে, অই গ সায়েব, আমার পাণটো কেমন করছে।

রবিনসন বলে উঠলেন, ভগবানের নাম লাও লকা। ভগবানের নাম লাও।··

বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারও গায়ের মধ্যে কেমন করছে। বুকের ভিতরে ভয়ংকর ধকধক করছে। সে ছুটে বাইরের অন্ধকারে থমকে দাঁড়াল। ঢাক বাজছে। পশুরা চীৎকার করছে চারিদিকে।

বিদ্যুতের মনে হল, সে পৃথিবীর বাইরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীটাকে দেখছে। গোটা পৃথিবীর সমস্ত রূপ রঙ সে যেন দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে তার।ভয় করল। ঠাকুর-দালানের আলো লক্ষ্য করে সে এগিয়ে গেল। খানিকটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দেখল, উঠোনে একটা কালো মোষ উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে। আর মানুষেরা হাততালি দিচ্ছে। ঢাকীরা ঢাক বাজাচ্ছে। মানুষেরা হাসছে, হল্লা করছে।

কে একজন চীৎকার করে উঠল, শালোর মোষটো মাল টেনেছে হে।

অর্থাৎ মদ খাওয়ানো হয়েছে। মহিষের শরীরটা এখনও ভেজা। সদ্য স্নান করিয়ে এনেছে। চোখ দুটি টকটকে লাল এবং উদ্দীপ্ত বিভ্রান্ত ক্ষ্যাপা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

মহিষটা থমকে দাঁড়াল। কয়েকজন নাচতে লাগল ঢাকের তালে তালে। পাক দিতে লাগল মহিষটাকে। মহিষটাও পাক খেতে লাগল আস্তে আস্তে।

হঠাৎ একজন মহিষের পিছনের দু-পায়ের মাঝখান দিয়ে হাত চালিয়ে অন্তযুগ খুঁচিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মহিষটা উন্মত্ত বেগে লাফিয়ে উঠে চারদিকে দৌড়ুতে লাগল। হাততালি আর হাসির হল্লা ফেটে

পড়ল। ঢাকীরা ধেয়ে গেল মহিষটার দিকে। চকিতে পিছিয়ে এল আবার।

বিদ্যুতের মনে হল, সে পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীটাকে দেখছে।

কে একজন চীৎকার করে উঠল, মোষটাকে ধর এবার, বাঁধ। গলায় ঘি মাখাতে হবে।

সাঁওতাল এবং অন্যান্য প্রজারা পাঁঠাগুলি স্নান করিয়ে এক পাশে জড়ো করছে। ইতিমধ্যেই আর একটি বড় হাড়িকাঠ পোঁতা হয়েছে। নিশ্চয় মহিষটার জন্যে।

বিদ্যুৎ বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। যদিও মনে হল, বাড়ির সবাই উঠোনেই কিংবা ঠাকুর-দালানে রয়েছে—সে যে কেন বাড়ি যাচ্ছে, জানে না। কী করতে হবে কিছু যেন বুঝতে পারছে না। একটু শুতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু শুতে সে পারবে না। বাজসিদ্ধিতে সে শুতে পারবে না। কখন সন্ধ্যা হবে। কখন! এখনও যে রাত পুইয়ে আলো ফোটেনি। তাই মনে হয়, রাত শেষ হয়নি। কিন্তু নির্ঘণ্ট অনুযায়ী মহানিশা শেষ হয়ে এল।

বাড়ির ভিতর অন্ধকার। ঘরগুলিতে আলো নেই। বিদ্যুৎ মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরগুলি বন্ধ না খোলা, বুঝতে পারল না। নেশার ঘোরে অন্ধকার দেখছে না তো সে। হাত-পা অসম্ভব গরম লাগছে। কানের ভিতর দিয়ে গরম বেরুচ্ছে। ঠোঁট দুটি অসম্ভব মোটা মনে হচ্ছে, তাই কামড়াতে ভাল লাগছে। হাতগুলি মুঠি পাকাতে গিয়েও যেন মুঠি পাকাচ্ছে না। স্থূল লাগছে।

বিদ্যুৎ আবার ঠাকুর-দালানের দিকে অগ্রসর হতে গেল। পশ্চিমের ঘরের দরজা থেকে আভার গলা ভেসে এল, এখন একটু শুয়ে পড়ুন না।

থমকে দাঁড়াল বিদ্যুৎ। বলল, তুমি!

—হ্যাঁ।

—ঘুমোওনি ?

—ঘুম আসে ?

বিদ্যুৎ পায়ে পায়ে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে থেকে দেখা পৃথিবীটা ঘুলিয়ে যাচ্ছে এখন। তার মস্তিষ্কের সীমায় বাজাসিদ্ধির আত্মা ভর করছে যেন। দরজার সামনে গিয়ে সে নিঃসঙ্কোচে আভার হাত ধরল।

আভা আবার বলল, ঘুমোবেন ?

—না।

গলার স্বর বদলে গেল বিদ্যুতের। মোটা আর ফ্যাসফেসে শোনাল। বলল, আমি মদ খেয়েছি।

আভা শান্ত সুরেই বলল, জানি।

—জান ? লকিয়ে দেখেছ।

—না। আপনি উঠোনে ঢুকতেই টের পেয়েছি। বারে বারে হোঁচট খাচ্ছিলেন।

—তাই বুঝি ? আমি টের পাইনি।

বলে বিদ্যুৎ আভাকে ঠেলে নিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকল। সে বুঝতে পারল না, আভা প্রতিবাদে শক্ত হয়ে উঠছে কি না।

সে আবার বলল, এ দেশে আমার ঘুম হবে না।

আভা বলল, তা হলে একটু এমনি শুয়ে থাকুন।

—না।

বিদ্যুৎ সহসা দু হাতে আভাকে জড়িয়ে ধরল। তার মনে হল, যেন ঠিক ধরা যাচ্ছে না। বলল, তুমি থাক আমার কাছে।

আভার কোন জবাব পাওয়া গেল না। বিদ্যুৎ ঝাঁকুনি দিল আভাকে। ডাকল, আভা !

আভার রুদ্ধ গলা শোনা গেল, বলুন।

বিদ্যুৎ সর্বাঙ্গে পিষ্ট করল আভাকে। আর এই পিষ্ট করার মধ্যে একটা আত্মধিক্কারের গ্লানি সে অনুভব করছে। তবু আগুনের হল্কার নিঃশ্বাস ফেলে, আভার বুকের ওপর এলিয়ে পড়তে গেল সে।

প্রবৃত্তির উন্মত্ত তাড়নায় কী করছে, সে বোধ তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মোম গলে যাবার মত তরল হয়ে লুটিয়ে পড়েছে সে।

আভা অত্যন্ত কষ্টে, অস্ফুটে বলল, আমার লাগছে।

—লাগুক।

সহসা যেন রুদ্র হয়ে উঠল বিদ্যুৎ। কাছেই তক্তপোশ এবং বিছানা রয়েছে মনে করে, আভাকে সে ঠেলে দিল সেদিকে। আভা মাটিতে পড়ে গেল। কারণ তক্তপোশ অনেকটা দূরে। চাপা অস্ফুট গলায় একবার আর্তনাদ করে উঠল আভা, উঃ।

বিদ্যুৎ এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে। বিদ্যুৎচকিতে যেন সংবিৎ ফিরল একবার। বলল, পড়ে গেলে?

জবাব পাওয়া গেল না।

—আভা!

কোনো জবাব নেই। বাইরে ঢাকের শব্দ এখন থেমেছে। বলি বন্ধ হয়ে গেল নাকি! কিন্তু বাইরে উল্লাসের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সহসা বিদ্যুতের মনে হল, আবার সে পৃথিবীটাকে পৃথিবীর বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছে। শিউরে উঠে ডাকল সে, আভা!

কোথা থেকে যেন জবাব এল, বলুন।

বিদ্যুৎ ফিসফিস করে বলল, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বিদ্যুতের গলা বন্ধ হয়ে এল যেন। আর সে তার কাঁধে স্পর্শ অনুভব করল। আভার গলা শোনা গেল, চুপ করুন।

বিদ্যুৎ তেমনি গলায় দ্রুত বলল, আমার ব্যাগটা কোথায় আছে দাও।

কেন?

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি দাও। আমি আর এখানে, এ বাড়িতে থাকব না। আমি সন্ধ্যাবেলা চলে যাব।

—না।

—না?

—না, ব্যাগ নিয়ে চলে যাবেন ?

—তোমাকে লজ্জা করছে, ভয় লাগছে।

—লাগুক।

—ক্ষমা করে দাও।

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে না, সে মাতালের মতো আর্ত স্বরে কথা বলছে। আভা দু-হাত রাখল বিদ্যুতের কাঁধে। বলল, চুপ করুন।

বিদ্যুৎ বলল, তবে আমি বাইরে যাই।

—যান।

—তুমি ?

—আমি যাব না।

—কেন ?

আভা নিরুত্তর।

—কেন ?

—আমি দরজা বন্ধ করে বসে থাকব।

—কেন ?

—আমি বলি দেখতে পারি না, ওদের ডাক শুনতে পারি না। এ সময়ে মানুষের মুখ দেখতে পারি না।

বিদ্যুৎ এক মুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে রইল, তুমি কাঁদছ ?

আভা কান্নারুদ্ধ গলায় বলল, আমি এ সব সইতে পারি না।

—কেন ?

—জানি না। মনে হয় ভগবান শুদ্ধ ভয়ে কাঁপছে। উঃ, লোকেরা কি সাংঘাতিক !

এই মুহূর্তে আভার সান্নিধ্য বিদ্যুৎ যেন সইতে পারছে না। সে সরে গেল। বলল, তবে আমি যাই।

—যান। বিদ্যুৎ যেন পালিয়ে গেল, বাঁচল। বাইরে তখন ঈষৎ আলো দেখা দিয়েছে কুয়াশায় মেঘ-ছড়ানো আকাশে।

ঠাকুর-দালানের উঠোনে ছুটে এল সে। বাড়ির নারী-পুরুষ সবাই সেখানে। আর হাড়িকাঠে সোনালী-রং মোষটার গলা চেপে ধরা।

পিছনের দুটি পা ধরে একজন টেনে ধরেছে প্রাণপণ শক্তিতে। আর একজন গলার দড়ি ধরে সামনে থেকে। একজন পাত্র থেকে ঘি নিয়ে দ্রুত লেপছে গলায়। হ্যাঁ, চোখ জ্বলছে প্রতিমার। জিভ যেন কাঁপছে। সবাই চীৎকার করে উঠল, জয় মা কালী! পরমুহূর্তেই স্তব্ধ। বলি! এবার বলি! অব্যর্থ নিশ্চিত। খড়্গ পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে পশুটার গলনালীতে একজন আঙুল ঢুকিয়ে দিল। রক্ত নিয়ে নিজের কপালে দিল। সবাই রক্ত মাখতে লাগল। তারপর পাঁঠা বলি শুরু হল। উঠোনে ভরে যেতে লাগল রক্তে।

বিদ্যুৎ একটা অন্ধ ঘোরে, গ্রামের পথে পথে ঘুরতে লাগল। বলি, সর্বত্র বলি। বাজসিদ্ধির পথে পথে রক্তের স্রোত বইছে। প্রতিটি পূজামণ্ডপে, উঠোনে, নালিতে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। শত শত আর নয়, সহস্রাধিক গিয়ে ঠেকেছে। সাঁওতাল-বাউরি-ব্রাহ্মণ, সবাই বলির পশুর মুণ্ড-কাটা ধড় নিয়ে, শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি খেলছে। মানুষের গায়ে মুখে রক্তের দাগ। পথে পথে সাঁওতালরা নাচতে আরম্ভ করেছে। হাঁড়ি উঁচু করে ধরে নরনারী নির্বিশেষে পচুই পান করছে।

সে দেখল, সাঁওতাল যুবক ছুটে গিয়ে সাঁওতাল যুবতীকে চেপে ধরেছে। যুবতী চীৎকার করছে। সাঁওতালরা হাততালি দিয়ে হাসছে।

এই তো পৃথিবীটাই! এই হত্যা, নৃত্য, পশ্বাচার, সবই যেন দুঃস্বপ্নে-দেখা পৃথিবীটায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কোন যুগ এটা? খ্রীস্টের জন্ম বছরের কত সংখ্যার সময় এটা?

রাত্রের মদের নেশা কেটে গিয়েছে বিদ্যুতের। কিন্তু নতুন নেশা লাগছে এখন। মত্ততার ঘোর থেকে মুক্ত হতে পারল না সে।

বিদ্যুৎ বাড়ি ঢুকল মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে। মেজবউ ডেকে তাড়াতাড়ি চান করে নিতে বললেন। জানালেন, আজ ভোগের মাংসাহার। স্নানের তেল দিলেন তিনি নিজেই।

বিদ্যুৎ না জিজ্ঞেস করে পারল না, আভা কোথায় ?

মেজবউ বললেন, উহার কথা আর বুল না বাবা। উ কি আজ আর গাঁয়ে আছে ? কুথাও পালিয়ে গেল্‌ছে গা।

বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত ভাবতে চেষ্টা করল আভার কথা। চকিতে একবার ভোর-রাত্রের কথা মনে পড়ল। এবং অবাক হল। এখন আর তার অনুশোচনা নেই। আভাকে অবাস্তব মনে হতে লাগল তার। দুর্বল ভীরু মনে হতে লাগল।

মত্ততার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে সে। স্নানাহার করল। কিন্তু এ বাড়িতে খাবার লোকজন না দেখে সে অবাক হল। মেজবউকে জিজ্ঞেস করল, আর কেউ খাবে না ?

মেজবউ বললেন, সব তো আজ গোলাবাড়িতে। সিথ্যানে দশটো পাঁটা রান্না হচ্ছে যে। তুমাকে তো ললিতা গোলাবাড়িতে খেতে বুইলছে। তুমি এলে, তাই খাইয়ে দিলাম।

বিদ্যুৎ আবার বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত মত্ততার মধ্যেও এখন তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তার শেষ লগ্ন আসন্ন। সে আর কিছুই ভাববে না। বাজসিদ্ধি তার পেছনে পড়ে থাকবে। বাজসিদ্ধির মানুষেরাও। কিন্তু বাজসিদ্ধির এই পৃথিবীতেই সংলগ্ন, কলকাতায় তাকে বাঁচতে হবে। দূর থেকে নয়, চটচটে মাছির মতো, ঘনিষ্ঠভাবে এই পৃথিবীর হত্যা, রক্ত, উন্মত্ত প্রমোদের মধ্যেই তাকে টিকে থাকতে হবে।

সারা গ্রামের মানুষের সঙ্গে বিদ্যুৎ বাজসিদ্ধির পশ্চিম প্রান্তরে বাজবাহিনীর মাঠে গেল। সাঁওতালরা নাচছে। মেয়েরা সাপের মতো সারা শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে নাচছে। পুরুষেরা মেয়েদের গা ছুঁয়ে ফিরে আসছে। শত শত মেয়ে। শত শত পুরুষ॥ বিদ্যুতের মনে হল, গোটা প্রান্তর হেলে দুলে নাচছে।।

তারপর পশ্চিম আকাশটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। লাল মেঘ। প্রতিমাগুলি আসতে লাগল প্রান্তরে। বাজসিদ্ধির বড় নদীতে বিসর্জন হবে।

দেখতে দেখতে আকাশটা কালো হয়ে এল। বিদ্যুৎ দেখল, নাচ

শিথিল হয়ে যাচ্ছে, ছন্দ ভেঙে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই সে দেখল, পৃথিবীর আদিমতম নরনারী তার পায়ের কাছে নগ্ন হয়ে লুটিয়ে আছে। সে আদিম যুগে বস্ত্র ছিল না। সে দেখল, সাঁওতাল নরনারী আদিম সৃষ্টির লীলা খেলছে। গণলীলা। স্বাধীন, আবরণহীন। এখানে, ওখানে, সর্বত্র যুগল আর যুগল। বিবস্ত্র মানব-মানবী পশুর মত দ্বৈত-ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের পুরোহিত চীৎকার করে, পৃথিবীর মুক্ত সৃষ্টিরহস্য ঘোষণা করছে।

বিদ্যুতের মনে হল, তার প্রতিটি রোমকূপ থেকে রক্ত ছিটকে বেরুবে। তার মস্তিষ্কের মধ্যে সেই পাগলা মহিষটা যেন দাপাদাপি করছে।

আশ্চর্য! কেন অবাক হচ্ছে বিদ্যুৎ! এটা কি পৃথিবীর প্রত্যক্ষ রূপ নয়! রুদ্রভৈরবের মন্দিরের কথা তার মনে পড়ল। সে এক পাশ থেকে দেখল, গ্রামের সমস্ত গরীব নরনারী বাজবাহিনীর মাঠে। এই সুযোগ। আর সময় নেই।

সে গ্রামের দিকে ছুটল। ব্যাগ নিতে হবে। অস্ত্রসহ বেরুতে হবে।

গ্রামটা নিঃশব্দ। যেন জনহীন। কুকুরগুলিও চলে গেছে হয় তো। ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে বিদ্যুৎ দেখল, উঠানে কে দাঁড়িয়ে। কাছে গিয়ে দেখল আভা। বলল, তুমি?

আভা বলল, লকা দালানের পিছনে কেমন যেন চীৎকার করছে। আমার ভয় করছে।

সেই মুহূর্তেই শুনতে পেল সে লকার চীৎকার, অই গ বড়কত্তা, বড়কত্তা...

চীৎকারটা শুধু ডাক নয়। আরো কিছু। বিদ্যুৎ ছুটে গেল। ঘরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। লকা মাটিতে শুয়ে চীৎকার করছে। ভোমন চক্রবর্তী মাথার চালায় ঝুলছেন। নিজের থানটি ছাড়া আর কিছু তিনি খুঁজে পাননি। চাউনি তাঁর মাটির দিকে। অপলক চাউনি। মুখটা হাঁ করা, যেন হাঁ করে হাসছেন। বিদ্যুতের মনে পড়ল, এ মুখ সে দেখেছে। প্রতিমার গলায় ছিল এ মুখ।

সে প্রায় চুপি চুপি বেরিয়ে এল। স্বর্গযাত্রা, প্রতীক-প্রস্তর চমকার সাহেব, নানকু, নীলাম, ডিক্রি, বলি-নাচ আর গণমিলন, স‍· যেন এখনো ঢাকের শব্দে বাজছে। আভার সামনে এসে সে দাঁড়াল আর বিড়বিড় করল, ডোমন চক্রবর্তী হারিয়ে দিয়ে গেলেন কলকাতার ছাড়পত্র গেল। পারলাম না। কলকাতা আর বাজসিদ্ধি কোথাও বাঁচার মত শক্ত হতে পারিনি। ডোমন চক্রবর্তীর স্বর্গযাত্র আমি নিতে পারলাম না।

আভা বলল, আপনি কী বলছেন ?

বিদ্যুৎ বলল, আলো জ্বালো আভা, বিছানা পেতে দাও পশ্চিমে ঘরে। আমি ঘুমোব।

বিদ্যুৎ শুয়ে পড়ল। আর একটি ঠাণ্ডা নরম হাত তার উত্ত‍· কপালে ঘুমের মত নেমে এল।
